ঈশ্বর সর্বশক্তিমান



Nipen

সনাতনী শাস্ত্র গৃহ PDF ভান্ডার

বেদ, উপনিষদ,স্মৃতি, পুরান,এবং বিভিন্ন গ্রন্থের সকল পিডিএফ পাওয়া যায়





আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকা সকল সনাতনী বন্ধুদের ইনভাইট করুন,

ওঁম শান্তিঃ

সনাতনী শাস্ত্র গৃহ PDF ভান্ডার







শ্রী নিপন দেববর্মা

শ্রী গৌরাঙ্গ বর্মা

......গ্রুপ পরিচালনায়....



ক) **ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা** (যোগ. ১।২৩)—সর্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করা।

খ) **তস্য বাচকঃ প্রণবঃ** (যোগ. ১।২৭) — প্রণব অর্থাৎ ওঁ হল ঈশ্বরের সংকেত। ঈশ্বর ও ওঁ—একই, পৃথক নয় এবং তা সৃষ্টির আদি থেকেই।

গ) **তজ্জপস্তদর্থভাবনম্** (যোগ. ১-২৮)—অর্থসহ নিরন্তর প্রণবের জপ। ওঁ অর্থাৎ আমিই সেই—আমিই সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা।

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত 'যোগদর্শন' যোগীকে পথনির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সাবধানও করেছেন। কারণ সাধনের দ্বারা, সমাধির দ্বারা সাধক অসীম ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও সিদ্ধির অধিকারী হন। শুরু হয় সাধকের পরীক্ষা—চারিদিকে প্রলোভনের ছড়াছড়ি। **'স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট প্রসঙ্গাৎ'** (যোগ. ৩।৫১)—এই সময় বহু উচ্চস্তরের দেবতাগণ, দিব্যপুরুষগণ দর্শন দেন, আমন্ত্রণ জানান তাঁদের লোকে আসার জন্য। কিন্তু এতে গর্বিত হওয়া বা সঙ্গ করার ইচ্ছা করা—দুটোই যোগভঙ্গের জন্য যথেষ্ট।

যোগদর্শনের মূল সূত্রগুলো সহজেই বোধগম্য হয়। তবে এমন অনেক সূত্র আছে যা খুবই সূক্ষ্ম এবং ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। সেখানে সাধককে অসীম ধৈর্য সহকারে, নিষ্ঠাসহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কারণ তিনি তাঁর চারিদিকের দৃশ্যমান জগৎ নয়—এক অদৃশ্য রহস্যময় জগতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে চলেছেন।

শ্রদ্ধেয় হরিকৃষ্ণদাস গোয়ন্দাকৃত হিন্দীব্যাখ্যা সহিত যোগদর্শন গ্রন্থ গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর থেকে বেশ কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি এটির বিপুল প্রচার এর বিশেষ জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। সেই গ্রন্থেরই অনুবাদরূপে উপস্থাপিত এই বাংলা যোগদর্শন। ওই হিন্দী সংস্করণের যতদূর সম্ভব বিশ্বস্ত অনুসরণের প্রয়াস এখানে করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই মহাগ্রন্থের সূত্রগুলোর গূঢ় অর্থ উদ্‌ঘাটনে ঁকালীবর বেদান্তবাগীশকৃত 'পাতঞ্জল দর্শন' পুস্তকটি আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাঁকে আমার শত শত প্রণাম।

শ্রীযুক্ত প্রণব কুমার অধিকারী মহাশয় এই অনুবাদটি আদ্যন্ত অবলোকন করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিমার্জনের দ্বারা এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ঈশ্বরের অহেতুক কৃপায় এই অনুবাদের কার্যটি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর কার্য, তিনিই করিয়েছেন। সেজন্য সবকিছুই ঈশ্বরে সমর্পিত হল।

এই গ্রন্থ পাঠ করে কেউ তৃপ্ত হলে সর্ব প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

—অর্পিতা

প্রথম হিন্দী সংস্করণের নিবেদন

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব তমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।

যোগদর্শন একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধকদের পক্ষে পরম উপযোগী শাস্ত্র। এটিতে অন্য দর্শনগুলির মতো খণ্ডন-মণ্ডনের জন্য যুক্তিবাদকে অবলম্বন না করে সরলভাবে খুবই অল্প শব্দের দ্বারা নিজস্ব সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সংস্কৃত, হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষায় এই গ্রন্থটির অনেক ভাষ্য এবং টীকা এ-যাবৎ লিখিত হয়েছে। ভোজবৃত্তি এবং ব্যাসভাষ্যের হিন্দী ভাষায় অনুবাদও কয়েকটি স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া স্বামী ওমানন্দ লিখিত 'পাতঞ্জলযোগ-প্রদীপ' নামক গ্রন্থটিও প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে ব্যাসভাষ্য এবং ভোজবৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য যোগবিষয়ক শাস্ত্রেরও অনেকানেক প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সদ্গ্রন্থ ও অন্য দর্শনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে এটিকে খুবই উপযোগী করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটি আকারে অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় এবং তার মূল্য অধিক হওয়ার কারণে এটি সর্বসাধারণের কাছে সুলভ হয়নি। এই সব কারণ চিন্তা করে পূজ্যপাদ শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার এবং শ্রীজয়দয়াল গোয়েন্দকার আদেশে আমি এটির 'সাধারণ হিন্দী ভাষাটীকা' লিখতে শুরু করেছিলাম। অল্প কয়েক দিনেই টীকাটি লেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় **'কল্যাণ'**-এর **'উপনিষদঙ্ক'**- প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয় এবং ঈশাবাস্য উপনিষদ্ থেকে শুরু করে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ পর্যন্ত নয়টি উপনিষদের টীকা লেখার দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়ে। সেজন্য যোগদর্শনের টীকার সংশোধনের কাজ করা যায়নি এবং প্রেসে ছাপবার সুযোগও ছিল না। তাছাড়া আরও অন্যান্য কাজও সম্পন্ন করার ছিল। ফলে প্রকাশের কাজে কিছু বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে কাগজের উপর

সরকারের নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ায় এবং প্রেসও ছাপবার অবকাশ পেয়ে যাওয়ায় এই টীকা এখন প্রকাশিত হচ্ছে।

পাঠকরা তো জানেন যে আমি বিদ্বান নই এবং অনুভূতি সম্পন্নও নই। অতএব যোগদর্শনের মতো গুরুগম্ভীর শাস্ত্রের টীকা লেখা আমার মতো অল্পজ্ঞ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা। তবু আমি আমার এবং বন্ধুদের সন্তোষ বিধানের জন্য যা বুঝেছি তা লেখবার ধৃষ্টতা করেছি। এজন্য অনুভবী বিদ্বান সজ্জনদের কাছে আমার সবিনয় প্রার্থনা যে এই টীকায় যদি কোনো ত্রুটি থাকে তবে তা যেন তাঁরা আমাকে অনুগ্রহ করে জানান। তাহলে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলির সংশোধন করা যাবে।

সমাধিপাদ

এই গ্রন্থের প্রথম পাদে যোগের লক্ষণ, স্বরূপ এবং প্রাপ্তির উপায়গুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে চিত্তবৃত্তির পাঁচটি ভেদ এবং সেগুলির লক্ষণ বলা হয়েছে। তাতে সূত্রকার নিদ্রাকেও বিশেষ চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত বলে গণ্য করেছেন (যোগদর্শন ১।১০)। অন্যান্য দর্শনকারদের মতো পতঞ্জলির মতে নিদ্রা বৃত্তিগুলির অভাবরূপ অবস্থা বিশেষ নয় এবং বিপর্যয়বৃত্তির লক্ষণ করার সময় একে মিথ্যাজ্ঞান বলে জানিয়েছেন। সুতরাং সাধারণভাবে এইটিই মনে হয় যে দ্বিতীয় পাদে 'অবিদ্যা' নামে যে প্রধান ক্লেশের বর্ণনা করা হয়েছে (যোগদর্শন ২।৫) সেটি এবং চিত্তের বিপর্যয়বৃত্তি—দুটি এক ; কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে তা ঠিক নয়। ওই মত মেনে নিলে যে যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় সেগুলির দিগ্‌দর্শন সূত্রগুলির টীকাতে করা হয়েছে (দেখুন যোগদর্শন ১।৮, ২।৩, ৫ এর টীকা)। দ্রষ্টা এবং দর্শনের একতারূপ অস্মিতা ক্লেশের কারণ হল 'অবিদ্যা' (যোগদর্শন ২।২৪)। সেই অস্মিতাকে চিত্তের কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে (যোগদর্শন ১।৪৭, ৪।৪)। এই অবস্থায় অস্মিতার কার্যরূপ চিত্তবৃত্তি কীকরে অবিদ্যা হতে পারে, যা নাকি অস্মিতারই কারণরূপ, সেকথা বিচার্য।

এই পাদের সতেরো এবং আঠারোতম সূত্রে সমাধির লক্ষণগুলির বর্ণনা খুবই সংক্ষেপে করা হয়েছে। এর পরে একচল্লিশতম সূত্র থেকে আরম্ভ

করে এই পাদের সমাপ্তি পর্যন্ত এই বিষয়েরই পুনরায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি এতই কঠিন যে সমাধির ওই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাকে ঠিকভাবে বুঝে নেওয়া খুবই দুষ্কর। আমি আমার সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা ওই সূত্রগুলির টীকায় বিষয়টিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। তবে একথা বলা যায় না যে এতেই পাঠকেরা সন্তোষ লাভ করবেন। কেননা সূত্রকার সেখানে আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত সমাধির স্বরূপ স্পষ্ট ভাষায় জানাননি। এইরকম, গ্রহণ এবং গ্রহীতা বিষয়ক সমাধির আলোচনাও স্পষ্ট ভাষায় করা হয়নি। তার ফলে বিষয় খুবই জটিল হয়ে গিয়েছে। এজন্যই সুপ্রসিদ্ধ টীকাকারদেরও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ সম্পর্কীয় আলোচনায় মতভেদ দেখা দিয়েছে। কারও সিদ্ধান্তেই সম্পূর্ণ সন্তোষ হয় না। আমি যথাসাধ্য পূর্বাপর সম্বন্ধের সঙ্গতি স্থাপন করে বিষয়টিকে সরল করবার চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় যে অনুভবী মহাপুরুষদের উপদেশানুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক অভ্যাস করার দ্বারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হলে তা বোঝা যেতে পারে এবং তখনই সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ হতে পারে।

প্রধানত যোগের তিনটি প্রভেদ মানা হয়েছে—এক সবিকল্প, দুই নির্বিকল্প এবং তিন নির্বীজ। এই পাদে নির্বীজ সমাধির উপায় প্রধানত পর-বৈরাগ্যকে জানিয়ে (যোগ ১।১৮) তারপরে দ্বিতীয় সরল উপায় ঈশ্বরের শরণাগতি বলে জানিয়েছেন (১।২৩)। শ্রদ্ধালু আস্তিক সাধকদের পক্ষে এটি খুবই উপযোগী। ঈশ্বরের মহত্ত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে এই সিদ্ধান্তে সাধারণভাবে বদ্ধ তথা মুক্ত পুরুষদের ঈশ্বরের থেকে ভিন্নতা এবং অনেকতা সিদ্ধ হয়। যোগদর্শনের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাংখ্যশাস্ত্রের অনেকটা মিল রয়েছে। যদিও কিছু কিছু লোক সাংখ্যশাস্ত্রকে নিরীশ্বরবাদী বলে থাকেন তবু সাংখ্যশাস্ত্র ভালভাবে বিচার করলে এই কথা ঠিক বলে মনে হয় না। কেননা সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় পাদের ৫৬ এবং ৫৭ সংখ্যক সূত্রে স্পষ্ট করে সাধারণ পুরুষদের অপেক্ষা ঈশ্বরের বিশেষতাকে স্বীকার করা হয়েছে। অতএব সাংখ্য এবং যোগের তাত্ত্বিক বিবেচনায় বর্ণনা শৈলীর অতিরিক্ত অন্য কোনো মতভেদ প্রতীত হয় না।

উপরোক্ত তিনটি প্রভেদের মধ্যে সম্প্রজ্ঞাতযোগের দুটি বিভাগ আছে। তার মধ্যে যে সবিকল্প যোগ রয়েছে সেটি তো পূর্বাবস্থা, তাতে বিবেকজ্ঞান হয় না। দ্বিতীয় যে নির্বিকল্প যোগ, যাকে নির্বিচার সমাধিও বলা হয়, তা যখন নির্মল হয়ে যায় (যোগ. ১।৪৭) তখন তাতে বিবেকজ্ঞান প্রকটিত হয়। সেই বিবেকজ্ঞান পুরুষখ্যাতি পর্যন্ত হয়ে যায় (যোগ. ২।২৮ ; ৩।৩৫) যা হল পর বৈরাগ্যের হেতু (যোগ. ১।১৬)। কেননা প্রকৃতি ও পুরুষের প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের সকল গুণ এবং তাদের কার্যে আসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন চিত্তে কোনো বৃত্তিই থাকে না। এইটি হল সকলবৃত্তি নিরোধরূপ নির্বীজ সমাধি (যোগ. ১।৫১)। একে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং ধর্মমেঘ সমাধিও (যোগ. ৪।২৯) বলা হয়। এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা যথাস্থানে করা হয়েছে। নির্বীজ সমাধিই যোগের অন্তিম লক্ষ্য। এতে আত্মার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা অথবা বলা যায় কৈবল্য স্থিতি হয় (যোগ. ৪।৩৪)।

নিরোধ অবস্থায় চিত্তের অথবা তার কারণস্বরূপ তিনটি গুণের সম্পূর্ণরূপে নাশ হয় না। কিন্তু জড়-প্রকৃতি-তত্ত্বের সঙ্গে যে চেতনতত্ত্বের অবিদ্যাজনিত সংযোগ আছে তার সম্পূর্ণ অভাব ঘটে।

সাধনপাদ

এই দ্বিতীয় পাদে অবিদ্যা প্রভৃতি পাঁচটি ক্লেশকে সমস্ত দুঃখের কারণ বলা হয়েছে। কেননা এইগুলি থাকা অবস্থায় মানুষ যা কিছু কর্ম করে সেগুলি সংস্কারের রূপ নিয়ে অন্তঃকরণে একত্র হতে থাকে। এই সংস্কারগুলির সমষ্টির নাম হল কর্মাশয়। এই কর্মাশয়ের কারণভূত ক্লেশ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জীবকে তার ফল ভোগের নিমিত্ত নানাপ্রকারের যোনিতে বার বার জন্মাতে ও মরতে হয় এবং পাপকর্মের ফল ভোগের জন্য ঘোর নরকে পতিত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়। পুণ্যকর্মের ফলের জন্য যে উত্তম যোনি এবং সুখ-ভোগের উপযোগী সামগ্রী লাভ হয়ে থাকে সেগুলিও বিবেকের দৃষ্টিতে দুঃখই (যোগ. ২।১৫) বলা হয়। অতএব সকল দুঃখের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির জন্য ক্লেশগুলির মূলোচ্ছেদ করা একান্ত

প্রয়োজন। এই পাদে সেগুলিকে বিনষ্ট করার উপায় রূপে নিশ্চল এবং নির্মল বিবেকজ্ঞানকে (যোগ. ২।৩৬) তথা সেই বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যোগসম্পর্কিত আটটি অঙ্গের অনুষ্ঠানের (যোগ. ২।২৮) কথা বলা হয়েছে। এইজন্য সাধকদের উচিত উল্লিখিত যোগের সাধনগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করা।

বিভূতিপাদ

এই তৃতীয় বিভূতিপাদে ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি—একত্রে এই তিনটির নাম 'সংযম' জানিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যেয় পদার্থে সংযমের বিভিন্ন ফলের কথা জানান হয়েছে। এগুলিকে যোগের মহত্ত্ব, সিদ্ধি এবং বিভূতিও বলা হয়। সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্য সৃষ্টি করবার জন্য গ্রন্থকার এগুলির বর্ণনা করেছেন। এজন্যই এই পাদের সাঁইত্রিশতম, পঞ্চাশতম এবং একান্নোতম তথা চতুর্থ পাদের ঊনত্রিশতম সূত্রে ওইগুলিকে সমাধিতে বিঘ্ন বলে জানিয়েছেন। তাই সাধকদের ভুল করেও সিদ্ধির প্রলোভনে পড়া উচিত নয়।

কৈবল্যপাদ

এই চতুর্থ পাদে কৈবল্যপাদ প্রাপ্তিতে সক্ষম চিত্তের স্বরূপের প্রতিপাদন করেছেন (যোগ. ৪।২৬)। সেই সঙ্গে যোগদর্শনের সিদ্ধান্তে যে যে শঙ্কা উৎপন্ন হতে পারে সেগুলিরও সমাধান করেছেন। অন্তিমে ধর্মমেঘ সমাধির বর্ণনা করে (যোগ. ৪।২৯) তার ফল ক্লেশ এবং কর্মের সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব (যোগ. ৪।৩০) তথা গুণগুলির পরিণাম-ক্রমের সমাপ্তি অর্থাৎ পুনর্জন্ম না হওয়ার কথা বলেছেন (যোগ ৪।৩২)। মানুষকে মুক্তি প্রদান করে নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণ করার ফলে গুণগুলির কার্যসমূহের নিজ কারণে বিলীন হয়ে যাওয়া অর্থাৎ পুরুষের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যাওয়া হল গুণগুলির কৈবল্য স্থিতি আর গুণগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে গিয়ে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া হল পুরুষের কৈবল্য স্থিতি। এই কথা জানিয়ে (যোগ. ৪।৩৪) গ্রন্থের সমাপ্তি করা হয়েছে।

বিশেষ বক্তব্য

এইভাবে এই গ্রন্থটিতে খুবই অল্প কথায় আত্মকল্যাণের অনেক উপযোগী ও প্রত্যক্ষ উপায় জানান হয়েছে।

পাঠকদের উচিত হল গ্রন্থটির রহস্য বোঝার জন্য এটিকে আদ্যোপান্ত পড়ে সেই বিষয়ে চিন্তা করা। কোনো বিষয়ের বর্ণনা প্রকারান্তরে কোথায় কোথায় করা হয়েছে সেটিকে সর্বত্র লক্ষ্য করে পূর্বাপরের বিরোধাভাসকে দূর করে তার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করা। যতক্ষণ না নিজের মনে সম্পূর্ণ সন্তোষ হচ্ছে ততক্ষণ তার অনুসন্ধান করে যেতে হবে। অন্যান্য টীকাকারগণ তার সঙ্গতি কীভাবে করেছেন, বর্তমান অনুভবী সজ্জনগণ সেই বিষয়ে কী বলেছেন এবং মূল গ্রন্থ থেকে সরলভাবে কোনো রকম কষ্টকল্পনা ছাড়াই কী ভাব বেরিয়ে আসছে—এই সবকিছু গভীরভাবে চিন্তা করলে সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

বিবেকজ্ঞানের স্বরূপ, তার অবস্থা ভেদ এবং ফল প্রভৃতির তাৎপর্য বোঝবার জন্য যেমন প্রথম পাদের ৪৫ এবং ৪৯ সংখ্যক, দ্বিতীয় পাদের ২৬ থেকে ২৮ সংখ্যক, তৃতীয় পাদের ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫২, ৫৩ এবং ৫৪ সংখ্যক তথা চতুর্থ পাদের ২৫, ২৬ এবং ২৯ সংখ্যক—এইসব সূত্রগুলিকে সামনে রেখে সেইগুলি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। যদি অবিদ্যার স্বরূপকে নির্ণয় করতে হয় তাহলে প্রথম পাদের ৮ সংখ্যক, দ্বিতীয় পাদের ৩, ৪, ৫, ১২, ২৪, ২৫ সংখ্যক তথা চতুর্থ পাদের ১১, ২৮ এবং ৩০ সংখ্যক—এইসব সূত্রগুলিকে সামনে রেখে চিন্তা করতে হবে। যদি সমাধির স্বরূপকে তার অবান্তর ভেদগুলি সহ ভালভাবে বুঝে নিতে হয় তাহলে প্রথম পাদের ১৭ থেকে ২২ এবং ৪৯ থেকে ৫১, তৃতীয় পাদের ৩, ৯ থেকে ১২, ৩৫, ৩৭, ৪৪, ৪৭ এবং ৫০ তথা চতুর্থ পাদের ১, ২৯, ৩০, ৩২ এবং ৩৪ সংখ্যক—এইসব সূত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে গভীরতার সঙ্গে ভালভাবে চিন্তা করতে হবে। এইভাবে অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা করার সময়ও সেই বিষয়ের সকল সূত্রের দিকে দৃষ্টি

দিতে হবে। তা করলে গ্রন্থটির তাৎপর্য বোঝা সুবিধাজনক হয়ে যায়। এইটিই আমার অনুমান।

এই গ্রন্থে বিশিষ্ট পুরুষ ঈশ্বরকে প্রতিপাদন করে তাঁর শরণাগতিকে আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ঈশ্বরকে জানার ভিন্ন কোনো সাধনের কথা বলা হয়নি। এতে এইটিই অনুমান করা যায় যে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি প্রাকৃত তত্ত্বগুলি সেখানে পৌঁছাতে পারে না, এমনকি প্রকৃতিস্থ পুরুষেরও সেখানে পৌঁছানোর সামর্থ্য নেই। প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র এক বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের দ্বারাই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একথা বলা হয়েছে—

যদাঽঽত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।।

(২।১৫)

'যোগী যখন এখানেই প্রদীপ সদৃশ (আলোকময়) আত্মতত্ত্বের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করে নেন তখন তিনি সেই জন্মরহিত, নিশ্চল, সমস্ত তত্ত্ব থেকে বিশুদ্ধ পরমদেবকে জেনে সকল বন্ধান থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যান।'

সকল যথার্থ সম্বন্ধ কেবল সজাতীয় তত্ত্বের সঙ্গেই হতে পারে। বিজাতীয় তত্ত্বের সঙ্গে হতে পারে না। আত্মাই হল ঈশ্বরের সজাতীয় তত্ত্ব। অতএব তার দ্বারাই তাঁকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, অন্য জড় তত্ত্বের দ্বারা করা যায় না।

এই শাস্ত্রে প্রকৃতির চব্বিশটি ভেদ এবং আত্মা ও ঈশ্বর—এই প্রকারে মোট ছাব্বিশটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে প্রকৃতি তো জড় ও পরিণামশীল। অর্থাৎ তার ধর্ম হল নিরন্তর পরিবর্তিত হওয়া। অন্য দিকে মুক্ত পুরুষ এবং ঈশ্বর হলেন নিত্য, চেতন, স্বপ্রকাশ, অসঙ্গ, দেশকালাতীত, সম্পূর্ণ নির্বিকার এবং অপরিণামী। প্রকৃতিতে বদ্ধ পুরুষ অল্পজ্ঞ, সুখ-দুঃখের ভোক্তা—তারা ভাল-মন্দ যোনিতে জন্ম নেয় এবং দেশকালাতীত

হলেও তাদের একদেশীয় (পরিচ্ছিন্ন) বলে মনে করা হয়।

এতদ্ব্যতীত যোগশাস্ত্রে বর্ণিত সাধনগুলিকে প্রায় সকল উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি সমর্থন করে। সেজন্য প্রত্যেক সাধকের উচিত এই গ্রন্থে বর্ণিত সাধনগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলন করা।

বিনীত

হরিকৃষ্ণদাস গোয়ন্দকা

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচি

(১) সমাধিপাদ

(২) সাধনপাদ

(৩) বিভূতিপাদ

(৪) কৈবল্যপাদ



॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

পাতঞ্জলযোগদর্শন

সাধারণ বাঙলা ভাষাটীকাসহ

সমাধিপাদ—১

অথ যোগানুশাসনম্॥ ১ ॥

অথ=এখন ; **যোগানুশাসনম্**=পরম্পরাগত যোগবিষয়ক শাস্ত্র (আরম্ভ করা হল)।

ব্যাখ্যা—এই সূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগের সাথে অনুশাসন পদটির প্রয়োগ করে যোগশিক্ষার চিরন্তনতা সূচিত করেছেন এবং অথ শব্দের দ্বারা এটি আরম্ভ করার প্রতিজ্ঞা করে যোগসাধনার করণীয়তা ব্যক্ত করেছেন॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*এইভাবে যোগশাস্ত্রের বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করে-এখন যোগের সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা করছেন :*

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ॥ ২ ॥

চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ=চিত্তের বৃত্তিসকলের নিরোধ (সর্বতোভাবে স্থির হওয়া) ; **যোগঃ**=(হল) যোগ।

ব্যাখ্যা—এই গ্রন্থে প্রধানত চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই 'যোগ' নামে অভিহিত কথা হয়েছে॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*যোগ শব্দের পরিভাষা নির্দেশ করে এবার তার সর্বোচ্চ ফলের কথা ব্যক্ত করছেন :*

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥ ৩ ॥

তদা=সেই সময় ; **দ্রষ্টুঃ**=দ্রষ্টার ; **স্বরূপে**=আপন স্বরূপে ; **অবস্থানম্**=স্থিতি হয়।

ব্যাখ্যা—যখন চিত্তের বৃত্তিসকলের নিরোধ হয় তখন দ্রষ্টা (আত্মা) আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করে ; অর্থাৎ কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় (যোগ. ৪।৩৪) ॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ—*তবে কি চিত্তবৃত্তির নিরোধের পূর্বে দ্রষ্টা আপন স্বরূপে স্থিত থাকে না ?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হচ্ছে :*

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র॥ ৪ ॥

ইতরত্র=অন্য সময় (দ্রষ্টার) ; **বৃত্তিসারূপ্যম্**=বৃত্তির সদৃশ (মতো) স্বরূপ হয়।

ব্যাখ্যা—যতক্ষণ না যোগসাধনার দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, ততক্ষণ দ্রষ্টা আপন চিত্তবৃত্তি অনুযায়ী নিজের সত্তাকে বা স্বরূপকে ওই চিত্তবৃত্তির অনুরূপ বলেই মনে করতে থাকে, তার নিজ প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয় না। অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ অবশ্য কর্তব্য॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্তের অসংখ্য বৃত্তি, সেজন্য তাদের স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে সূত্রকার সেগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করছেন :*

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ=ক্লিষ্ট আর অক্লিষ্ট (ভেদযুক্ত) ; **বৃত্তয়ঃ**=বৃত্তিসকল ; **পঞ্চতয্যঃ**=পাঁচ প্রকার (হয়)।

ব্যাখ্যা—এই সমস্ত চিত্তবৃত্তিগুলি পরে বর্ণিত লক্ষণ অনুসারে পাঁচ প্রকারের হয়। আবার প্রত্যেক প্রকারের বৃত্তির দুটি করে ভেদ হয়। যেমন—ক্লিষ্ট অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশের পুষ্টিকারক এবং যোগসাধনায় বিঘ্নস্বরূপ। অন্যটি হল ক্লেশনাশক এবং যোগসাধনার সহায়ক। সাধকের কর্তব্য এই রহস্য সম্বন্ধে যথার্থভাবে জ্ঞানলাভ করে প্রথমে অক্লিষ্ট বৃত্তিগুলির দ্বারা ক্লিষ্ট

বৃত্তিগুলিকে দূর করা এবং পরে ওই অক্লিষ্ট বৃত্তিসকলেরও নিরোধ করে যোগে সিদ্ধ হওয়া॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত পাঁচ প্রকারের বৃত্তির লক্ষণ বর্ণনা করার জন্য প্রথমে তাদের নাম উল্লেখ করছেন :*

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ=(১) প্রমাণ, (২) বিপর্যয়, (৩) বিকল্প, (৪) নিদ্রা, (৫) স্মৃতি—এই পাঁচটি

ব্যাখ্যা—পরবর্তী সূত্রসমূহে সূত্রকার স্বয়ং এই পাঁচটির স্বরূপের বর্ণনা করেছেন। সেজন্য এখানে এদের বর্ণনা করা হয়নি॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ—*উপরিউক্ত পাঁচ প্রকারের বৃত্তির মধ্যে প্রমাণবৃত্তির ভেদ বলা হচ্ছে :*

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি॥ ৭ ॥

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ=প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (এই তিন) ; **প্রমাণানি**=(হল) প্রমাণ।

ব্যাখ্যা—প্রমাণবৃত্তি তিন প্রকারের হয়ে থাকে—সেগুলিকে এইভাবে বুঝতে হবে :

(১) **প্রত্যক্ষ-প্রমাণ**—বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যত পদার্থ আছে, তাদের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সাথে কোনো ব্যবধান ব্যতীত সম্বন্ধ হওয়ার ফলে যে অভ্রান্ত বা সংশয়রহিত জ্ঞান হয় তা প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা জাত। সেজন্য তা প্রমাণবৃত্তি। যখন প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা সাংসারিক পদার্থের ক্ষণভঙ্গুরতা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা জন্মায় অথবা সর্বতোভাবে সেখানে দুঃখের প্রতীতি হয় (যোগ. ২।১৫) এবং সাংসারিক পদার্থের প্রতি বৈরাগ্য আসে, যা চিত্তের বৃত্তিনিরোধে সহায়ক হয়, যার দ্বারা যোগসাধনায় মানুষের শ্রদ্ধা-উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—সেখানে জাত প্রমাণবৃত্তি হল অক্লিষ্ট। যখন প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা সাংসারিক পদার্থ মানুষের কাছে নিত্য ও সুখদায়ক বলে মনে হয়, ভোগের প্রতি আসক্তি জন্ম নেয় তখন তা বৈরাগ্যের বিরোধী ভাবকে বর্ধিত করে তোলে, ফলে সেই প্রমাণবৃত্তি হল ক্লিষ্ট।

(২) অনুমান-প্রমাণ—কোনো প্রত্যক্ষ দর্শনের সাহায্যে যুক্তিদ্বারা যে অপ্রত্যক্ষ পদার্থের স্বরূপের জ্ঞান হয়, তা হল অনুমান দ্বারা জাত প্রমাণবৃত্তি। যেমন—ধোঁয়া দেখলে অগ্নির বিদ্যমানতার জ্ঞান হয়, নদীতে বন্যা দেখে দূরদেশে বৃষ্টিপাতের জ্ঞান হয় ইত্যাদি। এক্ষেত্রেও যে সকল অনুমানের দ্বারা মানুষের মধ্যে সাংসারিক পদার্থের অনিত্যতা, দুঃখময়তা ইত্যাদি দোষের জ্ঞান হয় এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং যার ফলে যোগসাধনের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয় এবং যা আত্মজ্ঞানের সহায়ক—এগুলি হল অক্লিষ্ট এবং এর বিপরীত বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবেই ক্লিষ্ট।

(৩) আগম-প্রমাণ—বেদ, পুরাণ ও আপ্ত (যথার্থ বক্তা) পুরুষদের বচনকে আগম বলে। যে পদার্থ মানুষের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ নয়, যেখানে মানুষের অনুমান পৌঁছাতে পারে না, তার স্বরূপের জ্ঞান বেদ, শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বচনের দ্বারা হয়—তা হল আগম হতে জাত প্রমাণবৃত্তি। যে আগম-প্রমাণের দ্বারা মানুষের মধ্যে ভোগের প্রতি বৈরাগ্য আসে (গীতা ৫।২২) এবং যোগসাধনার প্রতি শ্রদ্ধা-উৎসাহ বৃদ্ধি পায় তা হল অক্লিষ্ট। যে আগম-প্রমাণের দ্বারা ভোগে প্রবৃত্তি, যোগ সাধনায় অরুচি দেখা দেয়—যেমন, স্বর্গে ভোগের আতিশয্য শুনে তাতে আকৃষ্ট হওয়া এবং তা প্রাপ্তির জন্য সকাম কর্মের প্রতি আসক্তি ও প্রবৃত্তি জন্মায়—তা হল ক্লিষ্ট॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*প্রমাণবৃত্তির ভেদের কথা বলে এখন বিপর্যয় বৃত্তির লক্ষণের কথা বলা হচ্ছে :*

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্॥ ৮ ॥

অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্=যা সেই বস্তুর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন ; **মিথ্যাজ্ঞানম্**=মিথ্যা জ্ঞান ; **বিপর্যয়ঃ**=(হল) বিপর্যয়।

ব্যাখ্যা—কোনো বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে না জেনে তাকে অন্য বস্তু বলে মনে করা—এই বিপরীত জ্ঞানই হল বিপর্যয়বৃত্তি—যেমন, ঝিনুককে রুপোর প্রতীতি। এই বৃত্তিও যদি ভোগের প্রতি বৈরাগ্য ও যোগমার্গের প্রতি

শ্রদ্ধা-উৎসাহ বর্ধিত করে তবে তা অক্লিষ্ট, নতুবা তা ক্লিষ্ট।

যে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বস্তুর যথার্থ জ্ঞান হয়, সেই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিপরীত জ্ঞানও হয়। এই মিথ্যা জ্ঞানও কখনো কখনো ভোগের প্রতি বৈরাগ্য সৃষ্টি করে। যেমন, ভোগ্য পদার্থের ক্ষণভঙ্গুরতা দেখে, অনুমান করে অথবা শুনে তাকে সর্বতোভাবে মিথ্যা জ্ঞান করা হল যোগ-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপরীত বৃত্তি, কেননা তা পরিবর্তনশীল হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা নয়, তথাপি এই মনোভাব ভোগীর মধ্যে বৈরাগ্য আনতে সমর্থ হয়, সেজন্য তা অক্লিষ্ট।

কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তির মতানুসারে বিপর্যয়বৃত্তি ও অবিদ্যা—দুই-ই এক। কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ অবিদ্যার নাশ হয় কেবলমাত্র অসম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারা (যোগ. ৪।২৯-৩০), যেখানে প্রমাণবৃত্তিও থাকে না। কিন্তু বিপর্যয়বৃত্তির নাশ তো প্রমাণবৃত্তির দ্বারাই হয়ে যায়। এছাড়া যোগশাস্ত্র অনুযায়ী বিপর্যয় জ্ঞান হল চিত্তের বৃত্তি। কিন্তু অবিদ্যাকে চিত্তবৃত্তি বলে মানা হয় না। কেননা তা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের স্বরূপের উপলব্ধির হেতুভূত সংযোগেরও কারণ (যোগ. ২।২৩-২৪) এবং অস্মিতা, রাগ ইত্যাদি ক্লেশেরও কারণ (যোগ. ২।৪)। এছাড়া প্রমাণবৃত্তিতে বিপর্যয়বৃত্তি নেই, কিন্তু সেখানেও রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশের অস্তিত্ব থাকে—এই কারণেও বিপর্যয়বৃত্তি ও অবিদ্যা এক হতে পারে না। বিপর্যয় বৃত্তি কখনো থাকে, কখনো থাকে না। কিন্তু অবিদ্যা কৈবল্য অবস্থার প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত নিরন্তর বিদ্যমান থাকে। এর (অবিদ্যার) নাশ হলে সমস্ত চিত্তবৃত্তির ধর্মী স্বয়ং চিত্তও আপন কারণের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় (যোগ. ৪।৩২)। কিন্তু প্রমাণবৃত্তির সময় বিপর্যয়বৃত্তির অভাব হলেও না রাগ-দ্বেষের নাশ হয়, না দ্রষ্টা-দৃশ্যের সংযোগের। এছাড়া প্রমাণবৃত্তি ক্লিষ্টও হয়। কিন্তু যে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়, তা ক্লিষ্ট নয়। অতএব এটাই মেনে নেওয়া ঠিক হবে যে চিত্তের ধর্মরূপ বিপর্যয়বৃত্তি ভিন্ন বস্তু তথা পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের কারণরূপা অবিদ্যা তা থেকে সর্বতোভাবে ভিন্ন ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*এবারে বিকল্পবৃত্তির লক্ষণ বলা হচ্ছে—*

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

শব্দজ্ঞানানুপাতী=যে জ্ঞান শব্দজনিত জ্ঞানের সাথে সাথে হয় ; (আর) **বস্তুশূন্যঃ**=বাস্তবে যে বিষয় নেই, তাই ; **বিকল্পঃ**=(হল) বিকল্প।

ব্যাখ্যা—যে চিত্তের বৃত্তি শব্দের আধারে কেবলমাত্র অস্তিত্বহীন পদার্থের কল্পনা করে তা হল বিকল্পবৃত্তি। তবে যদি তা বৈরাগ্য এবং যোগসাধনে শ্রদ্ধা ও উৎসাহ আনয়ন করে তথা আত্মজ্ঞানের সহায়ক হয় তবে তা অক্লিষ্ট, অন্যথায় তা ক্লিষ্ট।

আগম প্রমাণজনিত বৃত্তির দ্বারা জাত বিশুদ্ধ সংকল্প ভিন্ন শুধুমাত্র শোনা কথার উপর নির্ভর করে মানুষ যে বিভিন্ন প্রকার বৃথা সংকল্প করে সে সমস্তই বিকল্প বৃত্তির অন্তর্গত বলে মনে করা উচিত।

বিপর্যয় বৃত্তিতে বিদ্যমান বস্তুর স্বরূপের বিপরীত জ্ঞান হয় এবং বিকল্প বৃত্তিতে অবিদ্যমান বস্তুটি শব্দজ্ঞানের আধারে কল্পিত হয়—এই হল বিপর্যয় আর বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য।

যেমন কোনো ব্যক্তি শোনা কথার উপর নির্ভর করে আপন ভাবনা অনুযায়ী ভগবানের একটা রূপ কল্পনা করে নিয়ে তার ধ্যান করে। অথচ সে যে রূপের ধ্যান করে তাকে সে দেখেনি, না তা বেদ-শাস্ত্রসম্মত, না বাস্তবে ভগবানের সেরকম কোনো রূপ আছে—সবই কেবল কল্পনামাত্র। এই বিকল্পবৃত্তি মানুষকে ভগবানের চিন্তনে প্রবৃত্ত করায় সেজন্য তা অক্লিষ্ট। অন্যান্য যে সকল বিকল্পবৃত্তি ভোগে প্রবৃত্ত করায় তা ক্লিষ্ট। অতঃপর সমস্ত বৃত্তিতেই যে এই প্রকার ক্লিষ্ট আর অক্লিষ্টের মধ্যে পার্থক্য আছে—তা বুঝে নিতে হবে॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ—*এখন নিদ্রা বৃত্তির লক্ষণ বলা হচ্ছে :*

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা॥ ১০ ॥

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা=অভাবের জ্ঞানকে অবলম্বন (গ্রহণ) করে যে, এমন ; **বৃত্তিঃ**=বৃত্তি ; **নিদ্রা**=হল (নিদ্রা)।

ব্যাখ্যা—যখন মানুষের কোনো জ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র জ্ঞানের অভাবেরই প্রতীতি থাকে, সেই যে জ্ঞানের অভাবের জ্ঞান তা যে চিত্তবৃত্তির

আশ্রিত থাকে, তা হল নিদ্রাবৃত্তি [১]। নিদ্রাও চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। সেজন্যই তো মানুষ গাঢ় ঘুম থেকে উঠে বলে, 'আজ আমি এত ঘুমিয়েছি যে কিছুই জানি না।' এই স্মৃতিবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে নিদ্রাও একটি বৃত্তি, তা না হলে জেগে ওঠার পর কীভাবে তার স্মৃতি থাকে।

নিদ্রাও দু-রকমের হয়—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যে নিদ্রা হতে জেগে উঠলে সাধকের মন-ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক ভাবে ভরে ওঠে, বিন্দুমাত্র আলস্য থাকে না, যাকে যোগসাধনার পক্ষে উপযোগী ও আবশ্যক বলে মেনে নেওয়া হয় (গীতা ৬।১৭)[২] তা হল অক্লিষ্ট। দ্বিতীয় প্রকারের নিদ্রা ওই অবস্থায় পরিশ্রমের অভাবের বোধ জাগ্রত করিয়ে বিশ্রামজনিত সুখের প্রতি আসক্তি উৎপন্ন করে, সুতরাং তা হল ক্লিষ্ট॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ—*এখন স্মৃতিবৃত্তির লক্ষণ বলা হচ্ছে :*

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ=অনুভূত বিষয়টি আবৃত বা গোপন না থাকা অর্থাৎ প্রকাশিত হয়ে যাওয়া ; **স্মৃতিঃ**=(হল) স্মৃতি।

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প ও নিদ্রা—এই চার প্রকারের বৃত্তি দ্বারা অনুভূত বিষয়ের যে সংস্কার চিত্তের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে যায়, কোনো নিমিত্তবিশেষকে অবলম্বন করে তার পুনরায় উদ্বোধিত হওয়ার নাম স্মৃতি। উপরিউক্ত চার প্রকারের বৃত্তি ব্যতীত এই স্মৃতিবৃত্তির

---

[১]অন্যান্য দার্শনিকগণ নিদ্রাকে বৃত্তি বলে মনে করেন না, তাঁরা সুষুপ্তি অবস্থা স্বীকার করেন ; সেইজন্য 'নিদ্রাও একটা বৃত্তি' যোগদর্শনের এই নিজস্ব অভিমতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সূত্রে 'বৃত্তি' পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

[২]যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

দুঃখের নাশকারী যোগ তাঁদেরই সিদ্ধ হয়ে থাকে যাঁরা যথাবিধি আহার-বিহার করেন, কর্মে যথাযথ চেষ্টা করেন এবং যথাযথ নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন।

দ্বারাও যে সংস্কার চিত্তে উৎকীর্ণ হয়, তার থেকে পুনরায় স্মৃতিবৃত্তি উৎপন্ন হয়। স্মৃতিবৃত্তিও দু-প্রকারের হয়—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। যার স্মরণে মানুষের মধ্যে ভোগের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, যোগসাধনে শ্রদ্ধা উৎসাহ বর্ধিত হয়, আত্মজ্ঞান লাভের সহায়তা হয় তা হল অক্লিষ্ট। যার দ্বারা ভোগের প্রতি রাগ-দ্বেষ বর্ধিত হয় তা হল ক্লিষ্ট।

স্বপ্নকে অনেকে স্মৃতিবৃত্তি বলে মনে করেন কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে জাগ্রদবস্থার মতো সমস্ত বৃত্তিগুলির আবির্ভাব হতে দেখা যায়। অতএব কোনো একটি বৃত্তিতে তার অন্তর্ভাব মেনে নেওয়া উচিত হবে বলে মনে হয় না॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ—*এই পর্যন্ত যোগের কর্তব্যতা, যোগের লক্ষণ ও চিত্তবৃত্তির লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এখন ওই সমস্ত বৃত্তির নিরোধের উপায় বলা হচ্ছে।*

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

তন্নিরোধঃ=ওইগুলির (চিত্তবৃত্তিসমূহের) নিরোধ ; **অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাম্**=অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা হয়।

ব্যাখ্যা—চিত্ত বৃত্তির নিরোধের দুটি উপায়—এক, অভ্যাস ; দুই, বৈরাগ্য। চিত্তবৃত্তির প্রবাহ পরম্পরাগত সংস্কার অনুযায়ী সাংসারিক ভোগের প্রতি ধাবিত হয়। সেই প্রবাহকে রুদ্ধ করার উপায় হল বৈরাগ্য আর তাকে (চিত্তবৃত্তিকে) কল্যাণমার্গে নিয়ে যাওয়ার উপায় হল অভ্যাস[১]॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ—*দুটি উপায়ের মধ্যে প্রথমে অভ্যাসের লক্ষণ বলা হচ্ছে :*

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

---

[১]গীতায় বলা হয়েছে—

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। (৬।৩৫)

হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে (মন) বশ করা করা সম্ভব হয়।

তত্র=এই দুটির মধ্যে ; **স্থিতৌ**=(চিত্তের) স্থিরতার জন্য ; **যত্নঃ**=যে যত্ন করতে হয়, তা ; **অভ্যাসঃ**=(হল) অভ্যাস।

ব্যাখ্যা—স্বভাব চঞ্চল মনকে কোনো এক ধ্যেয়-র প্রতি স্থির করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করতে থাকার নাম 'অভ্যাস'। শাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের অভ্যাসের কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। এখানে সমাধিপাদের ৩২-৩৯ পর্যন্ত সূত্রে কয়েক প্রকারের অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে যেটি যে সাধকের পক্ষে সুবিধাজনক, যেটিতে তার স্বাভাবিক রুচি ও শ্রদ্ধা আছে সেটি তার জন্য উপযুক্ত॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*এখন অভ্যাসে দৃঢ় হবার উপায় জানাচ্ছেন :*

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাঽঽসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ॥ ১৪ ॥

তু=কিন্তু ; **সঃ**=সেই (অভ্যাস) ; **দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাঽঽসেবিতঃ**= দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর এবং যত্নসহকারে ব্যাপৃত থেকে অনুশীলন করলে ; **দৃঢ়ভূমিঃ**=দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা—সাধকের কর্তব্য হল অভ্যাসকে দৃঢ় করার জন্য নিজ সাধনের প্রতি কখনো অধৈর্য না হওয়া, আলস্য না করা। দৃঢ় বিশ্বাস যেন থাকে যে, পালিত অভ্যাস কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। অভ্যাসের শক্তিতে নিঃসন্দেহে মানুষ আপন লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এটা বুঝে নিয়ে অভ্যাসের জন্য কোনো নির্দিষ্ট কালের সীমা রাখবে না বরং আজীবন অভ্যাস করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে অভ্যাসে যেন ছেদ না পড়ে। অভ্যাস হবে নিরন্তর—অভ্যাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বা অবহেলা করা চলবে না। বরং অভ্যাসকে নিজ জীবনের অবলম্বন করে নিয়ে অত্যন্ত স্নেহভরে, প্রীতিপূর্বক সমস্ত অঙ্গ সমেত তার অনুশীলনে রত থাকতে হবে। এভাবে পালন করলেই অভ্যাস দৃঢ় হয়[১]॥ ১৪॥

---

[১]গীতায় এই সূত্রের ভাব এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে—

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্নচেতসা॥ (৬।২৩)

অর্থাৎ সেই যোগের অভ্যাস বিরক্তি বা নৈরাশ্যহীন চিত্তে নিষ্ঠাপূর্বক করা কর্তব্য।

সম্বন্ধ—*এখন বৈরাগ্যের লক্ষণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রথমে অপর-বৈরাগ্যের লক্ষণ বলছেন :*

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥ ১৫ ॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য=দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়সমূহে সর্বতোভাবে তৃষ্ণারহিত চিত্তের ; **বশীকারসংজ্ঞা**=যে বশীকার[১] নামক অবস্থা হয় তা ; **বৈরাগ্যম্**= হল বৈরাগ্য।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা এই লোকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভবযোগ্য যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর সমাহারকে এখানে 'দৃষ্ট' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আবার যা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ নয়, বেদ ও শাস্ত্রে যার প্রশংসা করা হয়েছে, আপ্ত পুরুষের নিকট শ্রুত (অনন্ত জীবন, অসীম আনন্দ, অনন্ত জ্ঞান) তেমন ভোগ্য বিষয়ের সমাহারকে 'আনুশ্রবিক' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। উপরিউক্ত দুই প্রকারের ভোগ হতে চিত্ত যখন সম্পূর্ণভাবে তৃষ্ণারহিত হয়ে যায়, যখন সেগুলি লাভ করার ইচ্ছা পর্যন্ত থাকে না, তখন সেই তৃষ্ণারহিত চিত্তের যে 'বশীকার' নামক অবস্থাবিশেষ তা হল 'অপর বৈরাগ্য' ॥ ১৫ ॥

সম্বন্ধ—*এবার পর-বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা হচ্ছে :*

তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্॥ ১৬ ॥

পুরুষখ্যাতেঃ=পুরুষ বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা ; **গুণবৈতৃষ্ণ্যম্**=প্রকৃতির গুণের প্রতি যে সর্বথা বিতৃষ্ণার ভাব জন্মায় ; **তৎ**=সেই ; **পরম্**=হল পর বৈরাগ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত চিত্তের বশীকারসংজ্ঞারূপ বৈরাগ্য দ্বারা সাধকের চিত্তে বিষয়বাসনার অভাব ঘটে এবং আপন ধ্যেয়-র প্রতি একাগ্র-চিত্ততা

---

[১] বৈরাগ্যের শুরু থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত চারটি অবস্থা। প্রথম অবস্থা—যতমান, দ্বিতীয় অবস্থা—ব্যতিরেক, তৃতীয় অবস্থা—একেন্দ্রিয়, চতুর্থ অবস্থা—বশীকার। এই বশীকার জ্ঞান উপস্থিত হলে ইহলোক, স্বর্গলোকের কথা তো দূরের কথা ব্রহ্মলোকের স্পৃহাও থাকে না।

আসে (যোগ. ৩।১২)। যখন সাধকের এরূপ পরিপক্ক সমাধি অবস্থা লাভ হয় তখন পুরুষ বিষয়ক (আত্ম-সাক্ষাৎকার) বিবেক-জ্ঞান প্রকট হয় (যোগ. ৩।৩৫)। সেই অবস্থায় প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ) ও তাদের কার্যসকল সাধককে বিন্দুমাত্র প্রলোভিত করতে পারে না (যোগ. ৪।২৬) এবং তখন সাধক সম্পূর্ণরূপে আপ্তকাম অর্থাৎ নিষ্কাম হয়ে যায় (যোগ ২।২৭) সেই রাগরহিত অবস্থাকে পর-বৈরাগ্য বলা হয়[১] ॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় বর্ণনা করে এখন চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ নির্বীজ যোগের স্বরূপ বলার জন্য প্রথমে তার পূর্বের অবস্থাকে অবান্তর ভেদসহ সম্প্রজ্ঞাত যোগ নাম দিয়ে বর্ণনা করছেন :*

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎসম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ=বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা—এই চারের সাথে সম্বন্ধযুক্ত (চিত্তবৃত্তির সমাধান) ; **সম্প্রজ্ঞাতঃ**=(হল) সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

ব্যাখ্যা—সম্প্রজ্ঞাত যোগের ধ্যেয় পদার্থ তিনটি—(১) গ্রাহ্য (ইন্দ্রিয়ের স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয়), গ্রহণ (ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ) ও গ্রহীতা (বুদ্ধির সাথে একত্বভাবপ্রাপ্ত পুরুষ) (যোগ ১।৪১)। যখন গ্রাহ্য পদার্থগুলিকে স্থূলরূপে সমাধি করা হয়, সেই সময় সমাধিতে যতক্ষণ পর্যন্ত শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্প বর্তমান থাকে, ততক্ষণ তা সবিতর্ক সমাধি। আর যখন সেগুলির কোনো বিকল্প থাকে না তখন তা নির্বিতর্ক সমাধি। একইভাবে যখন গ্রাহ্য ও গ্রহণের সূক্ষ্মরূপে সমাধি করা হয়, সেইসময় সমাধিতে যতক্ষণ শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্প বর্তমান থাকে, ততক্ষণ তা

---

[১] গীতাতেও যোগারূঢ় অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥

যখন যোগী ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে, বা কর্মে আসক্ত হয় না তথা সমস্ত রকম সংকল্প থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় তখন সে যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

সবিচার সমাধি আর যখন কোনো বিকল্প থাকে না তখন তা নির্বিচার সমাধি। নির্বিচার সমাধিতে বিচারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না থাকলেও আনন্দের অনুভব এবং অহংকারের যতক্ষণ সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ তা হল আনন্দানুগতা সমাধি। যখন সেখান থেকেও আনন্দের অনুভূতি লুপ্ত হয়ে যায় তখন তাকে অস্মিতানুগত সমাধি বলা হয়। এটাই হল নির্বিচার সমাধির নির্মলতা। এই পাদের ৪১ থেকে ৪৯ নং সূত্র পর্যন্ত এর বিস্তৃত বিচার করা হয়েছে ॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধ——*এখন অন্তিম যোগের স্বরূপের কথা বলছেন, যা সিদ্ধ হলে দ্রষ্টার আপন স্বরূপে স্থিতি হয় (যোগ.১।৩) ; যা এই শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় এবং যার দ্বারা কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্তি হয়।*

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥ ১৮ ॥

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ=বিরাম-প্রত্যয়ের অভ্যাস হল যার পূর্ব অবস্থা, আর ; **সংস্কারশেষঃ**=যাতে চিত্তের স্বরূপ সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেই যোগ ; **অন্যঃ**=হল অন্য।

ব্যাখ্যা——সাধকের যখন পর-বৈরাগ্যের প্রাপ্তি হয়, সেই সময় স্বভাবতই চিত্ত সাংসারিক পদার্থের দিকে ধাবিত হয় না বরং চিত্ত সেখান থেকে আপনা আপনিই উঠে যায়। ওই উপরত অবস্থার প্রতীতির নাম বিরাম (নিবৃত্তি)- প্রত্যয়। এই উপরতি (সংসার বিরক্তি) প্রতীতির অভ্যাস-ক্রমও যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন চিত্তে আর কোনো প্রকার বৃত্তি থাকে না (যোগ ১।৪১)। কেবল অন্তিম-উপরত-অবস্থার সংস্কারের সাথে যুক্ত চিত্ত থাকে (যোগ. ৩।৯-১০)। ক্রমে নিরোধ (অর্থাৎ এটা নয়, এটা নয়) সংস্কারের ক্রমের সমাপ্তিতে সেই চিত্ত আপন কারণে লয়প্রাপ্ত হয় (যোগ ৪।৩২-৩৪)। তখন প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় এবং দ্রষ্টার আপন স্বরূপে (সৎ-স্বরূপ) স্থিতি হয়। একেই অসম্প্রজ্ঞাতযোগ, নির্বীজ সমাধি (যোগ. ১।৪১) বা কৈবল্য অবস্থা (যোগ ২।২৫, ৩।৫৫, ৪।৩৪) প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে ॥ ১৮ ॥

সম্বন্ধ——*এ পর্যন্ত যোগ ও তার সাধনসমূহের সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল, এখন কোন সাধকের পক্ষে উপরি-উক্ত যোগ সত্বর সিদ্ধ হবে— তা জানাবার জন্য নতুন প্রকরণটি আরম্ভ করা হচ্ছে :*

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্‌॥ ১৯ ॥

বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্‌=বিদেহ ও প্রকৃতিলয় (অবস্থাপ্রাপ্ত) যোগিগণের (উপরি-উক্ত যোগকে) ; **ভবপ্রত্যয়ঃ**=ভবপ্রত্যয় বলা হয়।

ব্যাখ্যা—যাঁরা পূর্বজন্মে যোগসাধন করতে করতে বিদেহ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন অর্থাৎ শরীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শরীরের ঊর্ধ্বে স্থিত হবার অভ্যাসে দৃঢ় হয়েছিলেন, যাঁরা 'মহাবিদেহ' স্থিতিকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন (যোগ. ৩।৪৩) আর যাঁরা সাধন করতে করতে 'প্রকৃতিলয়' (যোগ. ১।৪৫, ৩।৪৮) পর্যন্ত স্থিতিতে উপনীত হয়েছিলেন কিন্তু কৈবল্য পদ প্রাপ্তির পূর্বেই দেহত্যাগ করেছিলেন—এই দ্বিবিধ যোগভ্রষ্ট যোগীরা পুনরায় যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মের যোগাভ্যাস বিষয়ক সংস্কারের প্রভাবে তাঁদের আপন স্থিতির বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয় (গীতা ৬।৪২-৪৩) এবং পুনরায় সাধন পরম্পরার অভ্যাস ব্যতীতই তাঁরা নির্বীজ সমাধি প্রাপ্ত হন। তাঁদের নির্বীজ সমাধি উপায়জাত নয় সেজন্য এর নাম 'ভবপ্রত্যয়'[১] অর্থাৎ এই সমাধির সিদ্ধিতে পুনরায় মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হওয়াই কারণ, সাধনসমুদায় নয়॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ——*অন্য সাধকগণের যোগ কীভাবে সিদ্ধ হয় ?—তা বলা হচ্ছে :*

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্‌॥ ২০ ॥

ইতরেষাম্‌=অন্য সাধকগণের (নিরোধরূপ যোগ) ; **শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বকঃ**=শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাপূর্বক (ক্রমানুসারে) সিদ্ধ হয়।

ব্যাখ্যা—যে কোনো সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া এবং সেই সাধনে অবিচলিত

[১]ভব=অবিদ্যা ; প্রত্যয়=কারণ।

থাকার মূল কারণ হল শ্রদ্ধা (ভক্তিপূর্বক বিশ্বাস)। যথার্থ শ্রদ্ধার অভাবেই সাধকের সাধনার উন্নতিতে বিলম্ব হয়, অন্যথায় কল্যাণকারী সাধনে বিলম্বের কোনো কারণ নেই। সাধনের জন্য কোনো অপ্রাপ্ত যোগ্যতা অথবা পরিস্থিতির প্রয়োজন হয় না। সেজন্য সূত্রকার শ্রদ্ধাকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে সাধকের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বীর্য অর্থাৎ শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যও একান্তভাবে আবশ্যক। শ্রদ্ধা ও বীর্য (শক্তিবিশেষ)—এই দুইয়ের সংযোগ ঘটলে সাধকের স্মরণশক্তি বা স্মৃতিশক্তি বলিষ্ঠ হয় এবং যোগসাধনের সংস্কার বারবার ফুটে ওঠে। তখন বিষয়-বিরক্ত সাধকের মন সমাহিত হয়ে যায়। একেই বলা হয় সমাধি (যোগ ১।৪৬ ; ৩।৩)। তখন স্বচ্ছ অন্তঃকরণের অধিকারী সাধকের বুদ্ধি 'ঋতম্ভরা' অর্থাৎ সত্যধারণের যোগ্যতা লাভ করে (যোগ. ১।৪৮)। এই বুদ্ধির নামই 'সমাধিপ্রজ্ঞা'। পর বৈরাগ্যের প্রাপ্তিতে সাধকের নির্বীজ সমাধিরূপ যোগ সিদ্ধ হয়ে যায়। গীতাতেও বলা হয়েছে—

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। (৪।৩৯)

জিতেন্দ্রিয় সাধনপরায়ণ ও শ্রদ্ধাবান মানুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে অনতিবিলম্বে অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ পরম শান্তি লাভ করেন।। ২০ ।।

সম্বন্ধ—*এখন অত্যধিক অভ্যাস-বৈরাগ্যের কারণে যোগে শীঘ্র সিদ্ধি ও অতি শীঘ্র সিদ্ধি হওয়ার কথা বলছেন :*

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।। ২১ ।।

তীব্রসংবেগানাম্=সাধনে যাঁর গতি তীব্র, তাঁর (নির্বীজ সমাধি) ; **আসন্নঃ**=শীঘ্র (সিদ্ধ) হয়।

ব্যাখ্যা—যে পুরুষের সাধন (অভ্যাস ও বৈরাগ্য) তীব্র গতিতে চলে, যিনি সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে তৎপরতাসহ আপন সাধনে রত থাকেন, তিনি যোগে শীঘ্র কৃতকার্য হন।। ২১ ।।

সম্বন্ধ—*কিন্তু*

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ॥ ২২ ॥

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ=সাধনের মাত্রা ধীর, মধ্যম ও অতি প্রবল হওয়ার জন্য ; **ততঃ**=তীব্র সংবেগগণের মধ্যে ; **অপি**=ও ; **বিশেষঃ**=(সময়ের) পার্থক্য হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—কার সাধন কী ধরনের, তার উপরও যোগ-সিদ্ধির সাফল্য নির্ভর করে। কেননা ক্রিয়াত্মক অভ্যাস ও বৈরাগ্য তীব্র হলেও বিবেক ও ভাবের ন্যূনাধিকতার কারণে সমাধিতে সিদ্ধিলাভের সময়ের মধ্যে পার্থক্য স্বাভাবিক কারণেই হয়ে থাকে। যে সাধকের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিবেকশক্তি ও ভাব কিছুটা সমুন্নত তাঁর সাধনের মাত্রা মধ্যম। যে সাধকের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিবেক, ভাব অত্যন্ত প্রবল, তাঁর সাধন অতিমাত্রাযুক্ত। সাধনে ক্রিয়া অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য খুব বেশি। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের যে ক্রিয়াত্মক বাহ্য স্বরূপ তা উপরের সূত্রে 'বেগ' নামে বলা হয়েছে এবং তার যে ভাবাত্মক আভ্যন্তর স্বরূপ তা হল তার মাত্রা অর্থাৎ স্তর। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে একই কাজের জন্য সমানভাবে পরিশ্রম করা সত্ত্বেও যে তার সিদ্ধিতে অধিক বিশ্বাস রাখে, যে মানুষ ওই কাজের ক্ষেত্রে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং যে তাকে প্রেম ও উৎসাহপূর্বক অনলসভাবে করতে থাকে—সে অন্যদের থেকে সাধনে শীঘ্রই পূর্ণতা লাভ করে। সমাধিতে সিদ্ধি লাভের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

সমাধি লাভের জন্য সাধনকারীদের মধ্যে শ্রদ্ধা, বিবেকশক্তি এবং ভাব প্রভৃতির আধিক্যের কারণে যার সাধন যত উচ্চস্তরের হয় এবং যার সাধনার অগ্রগতি যত তীব্র, সে সেই অনুসারে শীঘ্র অথবা অতি শীঘ্র সমাধি প্রাপ্ত হতে সক্ষম। একথা বোঝাতে গিয়ে সূত্রকার উপরিউক্ত দুটি সূত্রের রচনা করেছেন—এটাই মনে করা হচ্ছে। অতএব সাধকের উচিত কোনো শৈথিল্যের অবকাশ না দিয়ে আপন সাধনকে সর্বতোভাবে নিখুঁত রাখার চেষ্টা করা ॥ ২২ ॥

সম্বন্ধ—*এখন পূর্বোক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য অপেক্ষা নির্বীজ-সমাধি লাভের সহজ উপায় বলা হচ্ছে :*

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা॥ ২৩ ॥

বা=এছাড়া ; **ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ**=ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারাও (নির্বীজ সমাধিতে সিদ্ধি শীঘ্র হতে পারে)।

ব্যাখ্যা—ঈশ্বরে ভক্তি অর্থাৎ শরণাগতির নাম ঈশ্বর প্রণিধান (ঈশ্বরোপাসনা) (দ্রষ্টব্য যোগ. ২।১)। ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা নির্বীজ সমাধি শীঘ্র সিদ্ধ হতে পারে (যোগ. ২।৪৫)। কারণ ঈশ্বর সর্বসমর্থ। তিনি তাঁর শরণাগত ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভক্তের অভিলষিত সমস্ত কিছু পূরণ করেন (গীতা ৪।১১[১])॥ ২৩ ॥

সম্বন্ধ—*এখন ঈশ্বরের লক্ষণ (স্বরূপ) বলা হচ্ছে:*

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈঃ=ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়—এই চারের সঙ্গে ; **অপরামৃষ্টঃ**=যাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই (তথা) ; **পুরুষবিশেষঃ**=যিনি সমস্ত পুরুষের মধ্যে উত্তম, তিনিই ; **ঈশ্বরঃ**=হলেন ঈশ্বর।

ব্যাখ্যা—ক্লেশ পাঁচ প্রকার—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। এই পাঁচ প্রকার ক্লেশের বিস্তৃত বর্ণন দ্বিতীয় পাদের ৩নং সূত্র থেকে ৯ নং সূত্র পর্যন্ত করা হয়েছে। কর্ম চার প্রকার—পুণ্য, পাপ, পুণ্য ও পাপমিশ্রিত এবং পাপপুণ্যরহিত (যোগ. ৪।৭)। কর্মের ফলের নাম 'বিপাক' (যোগ.২।১৩)। যাবতীয় কর্ম সংস্কারের নাম হল 'আশয়' (যোগ. ২।১২)। এই চারের সঙ্গে সমস্ত জীবের অনাদি সম্পর্ক। মুক্তির পর জীবের অবশ্য এসবের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত এই সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ছিল। ঈশ্বরের তো কখনো কোনো কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল না, না আছে, না থাকবে। এজন্য ওই মুক্ত পুরুষের থেকেও ঈশ্বর হলেন 'বিশেষ' আর সেজন্যই সূত্রকার 'পুরুষবিশেষঃ' কথাটি

[১] যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

'যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমিও তদনুরূপভাবে তাঁর ভজনা করে থাকি।'

প্রয়োগ করেছেন॥ ২৪ ॥

সম্বন্ধ——*ঈশ্বরের বিশেষতার পুনঃ প্রতিপাদন করছেন :*

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্॥ ২৫ ॥

তত্র=সেই (ঈশ্বরে) ; **সর্বজ্ঞবীজম্**=সর্বজ্ঞতার বীজ (কারণ) অর্থাৎ জ্ঞান ; **নিরতিশয়ম্**=হল নিরতিশয়।

ব্যাখ্যা—যে বস্তুর চেয়েও অন্য কোনো বিরাট বস্তু আছে তা হল 'সাতিশয়'। আর যা থেকে বড় অন্য কিছু নেই তা হল 'নিরতিশয়'। ঈশ্বর হলেন জ্ঞানের অবধি (চূড়ান্ত), তাঁর জ্ঞান সর্বোচ্চ। তাঁর জ্ঞানের নিকট অন্য যাবতীয় জ্ঞানই স্বল্প। তাই তিনি 'নিরতিশয়'। ঈশ্বরের মধ্যে যেমন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, তেমনই ধর্ম-বৈরাগ্য-যশ-ঐশ্বর্য প্রভৃতির পরাকাষ্ঠার আধারও তাঁকেই বলা হয়েছে॥ ২৫ ॥

সম্বন্ধ——*তাঁর আরও অনেক বিশেষতার প্রতিপাদন করা হচ্ছে :*

পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ॥ ২৬॥

(সেই ঈশ্বর সকলের) **পূর্বেষাম্**=পূর্বজগণের ; **অপি**=ও ; **গুরুঃ**=হলেন গুরু ; **কালেন অনবচ্ছেদাৎ**=কেননা কালের দ্বারা তাঁর অবচ্ছেদ নেই।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন হওয়ার জন্য সকলের গুরু হিসাবে ব্রহ্মাকে মানা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনিও কালের দ্বারা সীমিত (গীতা ৮।১৭)। ঈশ্বর স্বয়ং অনাদি ও অন্য সকলেরই আদি (গীতা ১০।২-৩)। তিনি কালাতীত, কালের সেখানে গতি নেই অর্থাৎ কাল তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না। তিনি কালেরও কাল, মহাকাল। তাই তিনি পূর্বেজাত সকলেরই গুরু, তিনি বর্ষিষ্ঠ, তিনি আদি, তিনি উপদেষ্টা (শ্বেতা. ৩।৪, ৬।১৮)॥ ২৬ ॥

সম্বন্ধ——*ঈশ্বরের শরণাগতির প্রকার বলার জন্য তাঁর নামের বর্ণনা করা হচ্ছে :*

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তস্য=সেই ঈশ্বরের ; **বাচকঃ**=বাচক (নাম) ; **প্রণবঃ**=হল প্রণব (ওঁ-কার)।

ব্যাখ্যা—নাম ও নামীর সম্বন্ধ অনাদি ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাস্ত্রে নাম জপের অশেষ মাহাত্ম্য উল্লিখিত রয়েছে (তুলসীদাসকৃত রামায়ণ, বালকাণ্ড, দোহা ১৮ থেকে ২৭)। গীতাতেও জপ-যজ্ঞকে সমস্ত যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে (১০।২৫)। 'ওঁ' সেই পরমেশ্বরের বেদোক্ত নাম তাই তা মুখ্য (গীতা ১৭।২৩, কঠোপনিষদ্ ১।২।১৫-১৭)। সেইজন্য এখানে তার বর্ণনা করা হয়েছে। এর থেকে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ ঈশ্বরের যত নাম আছে সেগুলিকে জপ করার মাহাত্ম্যও বুঝে নিতে হবে ॥ ২৭ ॥

সম্বন্ধ—*ঈশ্বরের নাম বলার পর এখন তার প্রয়োগবিধি বলছেন :*

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

তজ্জপঃ=ওঁ-কারের জপ (এবং) ; **তদর্থভাবনম্**=তার (ওঁ-কারের) অর্থস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তন (করা উচিত)।

ব্যাখ্যা—সাধককে ঈশ্বরের নাম জপ ও তাঁর স্বরূপের স্মরণ-চিন্তন করতে হবে।[১] একেই পূর্বোক্ত ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি বা শরণাগতি বলা হয়। ঈশ্বর ভক্তির আরও অনেক প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু জপ ও ধ্যান সব সাধনার মুখ্য। সেইজন্য সূত্রকার এখানে কেবল নাম ও নামীর স্মরণরূপে একটি প্রকারেরই বর্ণনা করেছেন। গীতাতেও (৮।১৩) এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এটিকে উপলক্ষণ ভেবে ভগবদ্ভক্ত সকল সাধকেরই ঈশ্বরের প্রসন্নতাকে নির্বীজ সমাধির সিদ্ধিতে হেতু মনে করা উচিত অর্থাৎ ঈশ্বরের ভক্তির সকল অঙ্গকে ঈশ্বর প্রণিধানের অন্তর্গত ধরা উচিত ॥ ২৮ ॥

সম্বন্ধ—*ঈশ্বরের নাম-জপ ও স্বরূপ চিন্তনের ফলের বর্ণনা করা হচ্ছে :*

---

[১] প্রশ্নোপনিষদের ৫ম প্রশ্নোত্তরে ও মাণ্ডূক্য উপনিষদে ওঁ-কারের উপাসনার বিষয়টি সবিস্তারে বোঝানো হয়েছে।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

ততঃ=উক্ত সাধনের দ্বারা ; **অন্তরায়াভাবঃ**=বিঘ্নের অভাব ; **চ**=এবং ; **প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ**=অন্তরাত্মার স্বরূপের জ্ঞান ; **অপি**=ও (হয়ে যায়)।

ব্যাখ্যা—পরবর্তী দুটি সূত্রে বিস্তারিতভাবে যে সকল বিঘ্নের বর্ণনা করা হয়েছে, ঈশ্বরের ভজন-স্মরণের দ্বারা সেই সব বিঘ্ন নিজে থেকেই দূর হয়ে যায় এবং অন্তরাত্মার (দ্রষ্টা) স্বরূপের জ্ঞান উদিত হয়ে কৈবল্য অবস্থা পর্যন্ত লাভ হয়ে থাকে। সেজন্য এটি নির্বীজ সমাধি প্রাপ্তির অত্যন্ত সহজ উপায় ॥ ২৯ ॥

সম্বন্ধ—*পূর্ব সূত্রে যেসব অন্তরায়ের অভাব হওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলির নাম বলা হচ্ছে :*

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমি-কত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি= ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব—এই নয়টি ; (হল) ; **চিত্তবিক্ষেপাঃ**= চিত্তের বিক্ষেপ ; **তে**=এগুলিই হল ; **অন্তরায়াঃ**=অন্তরায় (বিঘ্ন)।

ব্যাখ্যা—যোগ সাধনায় ব্যাপৃত সাধকের চিত্তে বিক্ষেপ আনয়ন করে সাধককে বিচলিত করতে নয়টি বিঘ্ন উপস্থিত হয় :

(১) শরীর, ইন্দ্রিয়সমুদায় ও চিত্তে কোনো প্রকার রোগের উৎপত্তি হল 'ব্যাধি'।

(২) অকর্মণ্যতা অর্থাৎ সাধনে প্রবৃত্তি না হওয়ার স্বভাব হল 'স্ত্যান'।

(৩) আপন শক্তি অথবা যোগের ফলে সন্দেহ হওয়ার নাম 'সংশয়'।

(৪) যোগসাধনার অনুষ্ঠানকে অবহেলা করতে থাকা হল 'প্রমাদ'।

(৫) তমোগুণের আধিক্যে চিত্ত ও শরীরে ভারী-ভাব হওয়া এবং সেজন্য সাধনে প্রবৃত্তি না জন্মানো হল 'আলস্য'।

(৬) বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে তাতে আসক্তি জন্মে।

তখন চিত্ত হয় বৈরাগ্যহীন—একে বলা হয় 'অবিরতি'।

(৭) যোগ সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কারণে বিপরীত ভাবনা অর্থাৎ এই সাধনা ঠিক নয়—এরকম একটা মিথ্যা জ্ঞানের উদয় হওয়া হল 'ভ্রান্তিদর্শন'।

(৮) সাধন করা সত্ত্বেও যোগের ভূমিকা অর্থাৎ সাধনে স্থিতি প্রাপ্তি না হওয়া হল 'অলব্ধভূমিকত্ব'। এতে সাধক উৎসাহহীন হয়ে পড়ে।

(৯) যোগসাধনার দ্বারা কোনো ভূমিতে চিত্তের স্থিতিলাভ সত্ত্বেও তাতে স্থির না থাকা হল 'অনবস্থিতত্ব'।

এই নয় প্রকারের চিত্ত বিক্ষেপকেই অন্তরায়, বিঘ্ন ও যোগের প্রতিপক্ষী ইত্যাদি নামে বলা হয়েছে॥ ৩০ ॥

সম্বন্ধ—*এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিঘ্নের বর্ণনা করা হচ্ছে :*

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ ॥ ৩১ ॥

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসাঃ=দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব (অঙ্গ কম্পন), শ্বাস ও প্রশ্বাস—এই পাঁচটি বিঘ্ন ; **বিক্ষেপসহভুবঃ**= বিক্ষেপের সঙ্গে উপস্থিত হয় ।

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত চিত্ত বিক্ষেপের সঙ্গে আগত অন্যান্য পাঁচটি বিকার হল :

(১) **দুঃখ**—দুঃখকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।

আধ্যাত্মিক—কাম-ক্রোধের কারণে, ব্যাধি ইত্যাদির কারণে, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা ইত্যাদির জন্য মন-ইন্দ্রিয়-শরীরে যে তাপ অথবা দুঃখ দেখা দেয় তাকে 'আধ্যাত্মিক' দুঃখ বলা হয়।

আধিভৌতিক—মানুষ, পশু, পাখি, সাপ, বাঘ, সিংহ, মশা প্রভৃতি অন্যান্য জীবের কারণে যে পীড়া আসে তাকে বলা হয় 'আধিভৌতিক' দুঃখ।

আধিদৈবিক—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভূমিকম্প, বন্যা ইত্যাদি দৈবী ঘটনার কারণে যে দুঃখ হয় তাকে বলা হয় 'আধিদৈবিক' দুঃখ।

(২) **দৌর্মনস্য**—ইচ্ছা পূরণ না হওয়ার জন্য মনে যে ক্ষোভ দেখা দেয় তাকে বলা হয় 'দৌর্মনস্য'।

(৩) **অঙ্গমেজয়ত্ব**—শারীরিক কম্পন বা অস্থিরতাকে বলা হয় 'অঙ্গমেজয়ত্ব'।

(৪) **শ্বাস**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাইরের বায়ুর ভিতরে প্রবেশ অর্থাৎ বাইরের কুম্ভকে বিঘ্ন দেখা দেওয়া হল 'শ্বাস'।

(৫) **প্রশ্বাস**—অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরের বায়ুর বাইরে বেরিয়ে যাওয়া অর্থাৎ ভিতরের কুম্ভকে বিঘ্ন দেখা দেওয়া হল 'প্রশ্বাস'।

এই পাঁচটি উপসর্গ বিক্ষিপ্ত চিত্তেই দেখা দেয়, সমাহিত চিত্তে নয়। সেজন্য একে 'বিক্ষেপসহভূ' বলা হয়॥ ৩১ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত বিঘ্ন দূর করার অন্য উপায় বলা হচ্ছে :*

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

তৎপ্রতিষেধার্থম্=এগুলো দূর করার জন্য ; **একতত্ত্বাভ্যাসঃ**= একতত্ত্বের অভ্যাস (করা উচিত)।

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত দুই প্রকার বিঘ্নের নাশ ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা সম্ভব। এছাড়াও আরেকটি উপায় বলা হয়েছে। তা হল কোনো এক প্রীতিজনক বস্তুতে চিত্তকে স্থির করার প্রয়াস করতে হবে এবং বার বার করতে হবে। এতে একাগ্রতা আসবে। একে বলা হয় 'একতত্ত্বাভ্যাস'। এই অভ্যাসের দ্বারা একাগ্রতাশক্তি বাড়ে এবং বিঘ্ননাশ হয়॥ ৩২ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্তের অন্তরালে রাগ-দ্বেষাদি মল থাকার জন্য চিত্ত মলিন হয় এবং মলিন চিত্ত সহজে স্থির হতে চায় না। অতএব চিত্তের নির্মলতা আনতে সুগম উপায় বলা হচ্ছে :*

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাম্=সুখী-দুঃখী, পুণ্যাত্মা-পাপাত্মা—ক্রমান্বয়ে যেখানে এই চারটি বিষয় দেখা যায়, সেখানে ; **মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাম্**=মিত্রতা, দয়া, প্রসন্নতা ও উপেক্ষার ; **ভাবনাতঃ**=

ভাবনার দ্বারা ; **চিত্তপ্রসাদনম্**=চিত্ত স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—সুখী মানুষে মিত্রতার ভাব, দুঃখী মানুষে দয়ার ভাব, পুণ্যাত্মা পুরুষে প্রসন্নতার ভাব ও পাপিগণে উপেক্ষার ভাব রাখলে চিত্তের রাগ-দ্বেষ, ঘৃণা-ঈর্ষ্যা-ক্রোধ ইত্যাদি মলের নাশ হয় এবং শুদ্ধ ও নির্মল চিত্তের প্রকাশ ঘটে। সেজন্য সাধকের এগুলির অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন॥ ৩৩ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্ত শুদ্ধির অন্য উপায় বলা হচ্ছে :*

প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য॥ ৩৪ ॥

বা=অথবা ; **প্রাণস্য**=প্রাণবায়ুর ; **প্রচ্ছর্দনবিধারণাভ্যাম্**=বারংবার পরিত্যাগ ও ধারণ করার অভ্যাসের দ্বারাও (চিত্ত নির্মল হয়)।

ব্যাখ্যা—প্রাণবায়ুকে শরীর থেকে বারবার পরিত্যাগ ও যথাশক্তি বাহিরেই রুদ্ধ করে রাখার অভ্যাসের দ্বারাও মন নির্মল হয় এবং শরীরস্থিত নাড়ীর মল নষ্ট হয়ে যায় ॥ ৩৪ ॥

সম্বন্ধ—*প্রসঙ্গবশতঃ চিত্তের নির্মলতার উপায় বলে এখন মনকে স্থির করার অন্য সাধন বলছেন—*

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী॥ ৩৫ ॥

বিষয়বতী=বিষয়সম্বন্ধীয় ; **প্রবৃত্তিঃ**=প্রবৃত্তি ; **উৎপন্না**=উৎপন্ন হয়ে তা ; **বা**=ও ; **মনসঃ**=মনের ; **স্থিতিনিবন্ধনী**=স্থিতিকে ধরে রাখে।

ব্যাখ্যা—অভ্যাস করতে করতে সাধকের নানাপ্রকার দিব্য বিষয়ের সাক্ষাৎ হয়। ওই সব দিব্য বিষয়ের অনুভবকারিণী ওই বৃত্তির নাম 'বিষয়বতী প্রবৃত্তি' (যোগ ৩।৩৬)। এই প্রবৃত্তির উদয়ে সাধকের যোগমার্গে বিশ্বাস ও উৎসাহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তা আত্মচিন্তনের অভ্যাসে মনকে স্থির করার একটা হেতু বা উপায় হয়ে যায়॥ ৩৫ ॥

সম্বন্ধ—*এই ধরনের আরও উপায় বলছেন :*

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী॥ ৩৬ ॥

বা=এছাড়া (যদি) ; **বিশোকা**=শোকরহিত ; **জ্যোতিষ্মতী**=জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তি (উৎপন্ন হয় তাহলে তা)ও মনকে স্থিত করে দেয়।

ব্যাখ্যা—অভ্যাসের দ্বারা সাধকের যদি শোকরহিত জ্যোতির্ময় প্রবৃত্তির অনুভব হয়, তাহলে তা-ও মনের স্থিরতা আনে ॥ ৩৬ ॥

সম্বন্ধ—*এখন চিত্তের স্থিরতার অন্য উপায় বলছেন :*

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

বীতরাগবিষয়ম্=বীতরাগ পুরুষে নিবিষ্ট ; **চিত্তম্**=চিত্ত ; **বা**=ও (স্থির হয়ে যায়)।

ব্যাখ্যা—যে পুরুষের রাগ-দ্বেষ সর্বথা নষ্ট হয়ে গেছে, সেইরকম আসক্তিহীন পুরুষকে ধ্যেয় করে নিয়ে যে ধ্যান করে অর্থাৎ তাঁদের বৈরাগ্যযুক্ত ভাবকে যে মনন করে তার চিত্তও স্থির হয়ে যায় ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধ—*আরও অন্য উপায় জানাচ্ছেন :*

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনম্=স্বপ্ন ও নিদ্রার জ্ঞানকে অবলম্বনকারী চিত্ত ; **বা**=ও (স্থির হতে পারে)।

ব্যাখ্যা—স্বপ্নে যদি কোনো অলৌকিক দর্শন বা অনুভব হয়ে থাকে, যেমন—দেবমূর্তি বা ইষ্টমূর্তির দর্শন, তাহলে স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির স্মরণ-চিন্তন করলেও মন স্থির হয়ে যায়। গাঢ় নিদ্রায় কেবল চিত্তবৃত্তির অভাবের জ্ঞান থাকে, কোনো পদার্থের প্রতীতি হয় না। তেমনি সমস্ত বৃত্তির বাধ সম্পাদন করে বৃত্তিসমূহের অভাবের জ্ঞানকে অবলম্বন করলে অর্থাৎ তাকেই লক্ষ্য রূপে নির্দিষ্ট করে অভ্যাস করলেও চিত্ত স্থির হতে পারে। কিন্তু যে সময় তমোগুণের আবির্ভাব হয়, সেই সময় 'এটা অভ্যাস করা উচিত নয়।' চিত্তে ও ইন্দ্রিয়ে যখন সত্ত্বগুণের আধিক্য দেখা যায় তখন এই সাধন অধিক লাভজনক হতে পারে॥ ৩৮ ॥

সম্বন্ধ—*মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। সেজন্য সর্বসাধারণের উপযোগী সাধনের বর্ণনা করে এই প্রকরণের উপসংহার করছেন :*

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

যথাভিমতধ্যানাৎ=যার যা অভিমত, তার ধ্যানের দ্বারা ; **বা**=ও (মন

স্থির হয়)।

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত সাধনের মধ্যে যদি কোনো সাধন সাধকের অনুকূল না হয় তাহলে তাঁর আপন রুচি অনুযায়ী আপন ইষ্টের ধ্যান করা উচিত। আপন রুচি অনুযায়ী আপন ইষ্টের ধ্যান করলেও মন স্থির হয়ে যায়॥ ৩৯ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্তের স্থিরতার উপায় বলে চিত্ত যখন স্থির হবার যোগ্যতা অর্জন করে তখন তার স্থিতি কেমন হয় সেকথা এখন বলছেন :*

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ॥ ৪০ ॥

(সেই সময়) **অস্য**=এর ; **পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তঃ**=পরমাণু থেকে পরম মহত্ত্ব পর্যন্ত ; **বশীকারঃ**=বশীকার (অধিকার) হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা সাধকের চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় তখন সাধক আপন চিত্তকে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, বৃহৎ হতে বৃহত্তর মহান পদার্থ পর্যন্ত, যখন ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ স্থির করতে সমর্থ হয়। আপন চিত্তের উপর তার পূর্ণ অধিকার জন্মে। এটি চিত্তের স্থিরতা প্রাপ্তির যোগ্যতার নিদর্শনও বটে (গীতা ৬।১৯)॥ ৪০ ॥

সম্বন্ধ—*এই উপায়ের দ্বারা সাধক তার চিত্তকে বশীভূত করতে সমর্থ হয় এবং চিত্ত অত্যন্ত নির্মল হয়ে যায়। ওই নির্মল চিত্ত সমাধিস্থ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এরপর কী ক্রম অনুসারে সম্প্রজ্ঞাত নির্বীজ সমাধি সিদ্ধ হয়, তার বর্ণনা আরম্ভ করছেন :*

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ॥ ৪১ ॥

ক্ষীণবৃত্তেঃ=সমস্ত বাহ্য বৃত্তি সকল যার ক্ষীণ হয়েছে, এমনই ; **মণেঃ ইব অভিজাতস্য**=স্ফটিকমণি সমতুল্য নির্মল চিত্তের ; **গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু**=যে গ্রহীতা (পুরুষ), গ্রহণ (ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ), গ্রাহ্যর (পঞ্চভূত ও বিষয়) মধ্যে ; **তৎস্থতদঞ্জনতা**=স্থিত হয়ে যাওয়া ও তদাকার হয়ে যাওয়া, তাই হল ; **সমাপত্তিঃ**=সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

ব্যাখ্যা—পূর্বোক্ত অভ্যাসের দ্বারা সাধকের চিত্ত যখন স্বচ্ছ স্ফটিক মণির মতো অতীব নির্মল হয়ে যায়, যখন তার বাহ্য বৃত্তিসকল নিশ্চল হয়ে

যায়, থাকে শুধু ধ্যেয়—সেই সময় সাধক ইন্দ্রিয়ের স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম বিষয়াদি (যোগ. ৩।৪৪) অথবা অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় (যোগ. ৩।৪৭) অথবা বুদ্ধিস্থ পুরুষ (যোগ. ৩।৪৯)—এর যে কোনো একটি ধ্যেয়তে আপন চিত্তকে যখন স্থাপন করেন তখন সেখানেই স্থিতিলাভ করেন এবং চিত্ত সেই ধ্যেয় বস্তুতে স্থিতিলাভ করে তদাকার হয়ে যায়। একে বলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই সমাধিতে সাধক ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, সে বিষয়ে কোনো প্রকার সংশয় অথবা ভ্রমের অবকাশ থাকে না।[১]

সূত্রকার পরবর্তী সূত্রসমূহে আনন্দানুগত সমাধি, গ্রহণ অথবা ইন্দ্রিয়ানুগত এবং অস্মিতা অথবা পুরুষানুগত সমাধি,—এগুলির কোনোটি সম্পর্কেই আলোচনা করেননি—এজন্য এই বিষয়টি এখানে স্পষ্ট নয়, কিন্তু 'সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা বা অবধি অলিঙ্গ পর্যন্ত'—এ কথা বলেছেন। সেজন্য মন, ইন্দ্রিয় এবং অস্মিতাকে এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। সম্ভবত এজন্যই তিনি ইন্দ্রিয়ানুগত ও অস্মিতাগত সমাধির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা আলাদাভাবে বর্ণনা করেননি। কারণ তৃতীয় পাদের ৪৪, ৪৭ এবং ৪৮ নং সূত্রে যেখানে গ্রাহ্য বিষয়ক, গ্রহণ বিষয়ক আর গ্রহীতৃ বিষয়ক সংযমের ফল বলা হয়েছে, সেখানে গ্রাহ্যের সূক্ষ্মরূপের মধ্যে তন্মাত্রাগুলিকে এবং গ্রহণের সূক্ষ্ম-রূপের মধ্যে অস্মিতাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আনন্দও মনের গ্রাহ্য বিষয় হওয়ার জন্য একেও সূক্ষ্ম গ্রাহ্যবিষয়ক সমাধির অন্তর্গত বলে মনে করা যেতে পারে।[২]

---

[১]এই সমাধির বর্ণনা পূর্বের ১৭ নং সূত্রে পরিলক্ষিত হয়, সেখানে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা—এই চারের সমন্বয়ে জাত যোগকে সম্প্রজ্ঞাত বলা হয়েছে।

[২]কিছু কিছু টীকাকার বলেন যে বিতর্ক ও বিচারের স্থানে এখানে 'গ্রাহ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আনন্দের স্থানে 'গ্রহণ' শব্দ এবং 'অস্মিতা'র স্থানে 'গ্রহীতা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি স্থলের বর্ণনার মধ্যে একত্র আনার জন্য তাঁরা ওই সূত্রের টীকায় আনন্দের অর্থ ইন্দ্রিয় করেছেন এবং এই সূত্রে 'গ্রহীতা'র অর্থ অস্মিতা করেছেন। কিন্তু ব্যাসভাষ্যে এরকম করা হয়নি। সেখানে তিনি আনন্দের অর্থ আহ্লাদ এবং এখানে 'গ্রহীতা'র অর্থ সাধারণ পুরুষ ও মুক্ত পুরুষ—এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

অতএব এটা মেনে নেওয়া উচিত হবে বলে মনে হয় যে, পঞ্চ মহাভূত (আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী) ও তাদের কার্য হল স্থূল গ্রাহ্য বিষয় তথা তন্মাত্র ও তাদের সূক্ষ্ম কার্যসমূহ হল সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয়। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ গ্রহণ বিষয়ক সমাধির অন্তর্গত। এগুলিকে গ্রাহ্যবিষয়ক সমাধির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা অলিঙ্গ পর্যন্ত বলে নির্দেশ করার ফলে গ্রহণ বিষয়ক সমাধিরও বিচারানুগত সমাধিতে অন্তর্ভাব হয়ে যায়। এইভাবেই আহ্লাদের নামই 'আনন্দ'। এটি পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং মনের দ্বারা গ্রাহ্য। সেইজন্য তা সূক্ষ্ম বিষয়ের অন্তর্গত হয়েছে এবং তার ফলে গ্রাহ্য সমাধির অন্তর্ভুক্ত। এখানে যে গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধির কথা বলা হয়েছে তাও তৃতীয় পাদের ৩৫ নং সূত্র অনুসারে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ কালে পুরুষের স্বরূপে করা হয়ে থাকে। অতএব তা হল অস্মিতানুগত সমাধি—এটি বুঝে নিতে হবে, কেননা তার ফল পুরুষের জ্ঞান বলে ওই সূত্রেই বলা হয়েছে॥ ৪১ ॥

সম্বন্ধ—*সাধারণভাবে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্বরূপ জানিয়েছেন, এখন এর বিভিন্ন ভেদের কথা জানাচ্ছেন :*

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ॥ ৪২ ॥

তত্র=সেখানে ; **শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ**=শব্দ, অর্থ, জ্ঞান—এই তিনের বিকল্পসমূহের দ্বারা ; **সঙ্কীর্ণা**=সংকীর্ণ-মিলিত ; **সমাপত্তিঃ**=সমাধি ; **সবিতর্কা**=হল সবিতর্ক।

ব্যাখ্যা—গ্রাহ্য অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণযোগ্য পদার্থ দুই প্রকারের (১) স্থূল, (২) সূক্ষ্ম। এদের মধ্যে যে কোনো একটি স্থূল পদার্থকে লক্ষ্য রূপে স্থির করে তার স্বরূপকে জানার জন্য যখন যোগী আপন চিত্তকে তাতে অভিনিবিষ্ট করেন, তখন প্রথম দিককার অনুভবে সেই বস্তুর নাম, রূপ ও জ্ঞান—এই তিনটি বিকল্পের মিশ্রণ থাকে, অর্থাৎ তার স্বরূপের সাথে সাথে চিত্তে তার নাম ও প্রতীতিরও স্ফুরণ থাকে। সেজন্য এই সমাধিকে সবিতর্ক সমাধি বলা হয়। এরই নামান্তর হল সবিকল্প যোগ ॥ ৪২ ॥

সম্বন্ধ——*এর পর*—

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা॥ ৪৩ ॥

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ=(শব্দ ও প্রতীতির) স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ; **স্বরূপশূন্যা**=আপন স্বরূপ থেকে রহিত বা শূন্য হওয়া ; **ইব**=সদৃশ ; **অর্থমাত্রনির্ভাসা**=যা কেবল ধ্যেয়মাত্রের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করায় (চিত্তের যে স্থিতি) তা-ই; **নির্বিতর্কা**=হল নির্বিতর্ক সমাধি।

ব্যাখ্যা——পূর্বে উক্ত স্থিতির পর যখন সাধকের চিত্তে ধ্যেয় বস্তুর নামের স্মৃতিও লুপ্ত হয়ে যায় এবং তাকে বিষয় করে নেওয়া চিত্তবৃত্তিরও স্মরণ থাকে না, তখন আপন (চিত্তের) স্বরূপেরও ভান না থাকার জন্য তার স্বরূপের অভাবের মতো একটি স্থিতির উৎপত্তি হয় ; সেই সময় সমস্ত প্রকার বিকল্পেরও অভাব হয়ে যায় এবং ধ্যেয় পদার্থের সঙ্গে তদাকারতা প্রাপ্ত চিত্ত কেবলমাত্র ধ্যেয়কেই প্রকাশিত করে। ওই অবস্থার নাম 'নির্বিতর্ক' সমাধি। এতে শব্দ ও প্রতীতির কোনো বিকল্প থাকে না, সেজন্য একে 'নির্বিকল্প' সমাধিও বলা হয়॥ ৪৩ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে স্থূল ধ্যেয় পদার্থে জাত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভেদ ব্যক্ত করে এখন সূক্ষ্ম ধ্যেয়তে জাত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভেদ বলছেন :*

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা॥ ৪৪ ॥

এতয়া এব=এর দ্বারা (পূর্বোক্ত সবিতর্ক ও নির্বিতর্কের বর্ণনের দ্বারা) ; **সূক্ষ্মবিষয়া**=সূক্ষ্ম পদার্থে কৃত ; **সবিচারা**=সবিচার (আর) ; **নির্বিচারা**=নির্বিচার সমাধির ; **চ**=ও ; **ব্যাখ্যাতা**=বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা——স্থূল-ধ্যেয় পদার্থে কৃত সমাধির যেমন দুটি ভেদ থাকে, তেমনি সূক্ষ্ম-ধ্যেয় পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত সমাধিরও যে দুটি ভেদ থাকে তা বুঝে নিতে হবে অর্থাৎ যখন কোনো সূক্ষ্ম-ধ্যেয় পদার্থের স্বরূপের যথার্থ স্বরূপ জানার জন্য তাতে চিত্তকে নিবিষ্ট করা হয় তখন প্রথমে তার নাম-রূপ ও জ্ঞানের বিকল্পের সঙ্গে মিলিতরূপে যে অনুভব হয় সেই স্থিতি হল সবিচার সমাধি এবং তারপর যখন নামের ও জ্ঞানের অর্থাৎ চিত্তের নিজ

স্বরূপেরও বিস্মরণ হয়ে কেবল ধ্যেয় পদার্থের অনুভব থাকে, সেই স্থিতিকে বলা হয় নির্বিচার সমাধি॥ ৪৪ ॥

সম্বন্ধ——*এখন সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে কী কী গণনা করা হয় তা স্পষ্ট করা হচ্ছে :*

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্যবসানম্॥ ৪৫ ॥

চ=তথা ; **সূক্ষ্মবিষয়ত্বম্**=সূক্ষ্মবিষয়তা ; **অলিঙ্গপর্যবসানম্**=হল প্রকৃতি পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা——পৃথিবীর সূক্ষ্ম বিষয় হল গন্ধ-তন্মাত্রা, জলের রস-তন্মাত্রা, তেজের রূপ-তন্মাত্রা, বায়ুর স্পর্শ-তন্মাত্রা ও আকাশের শব্দ-তন্মাত্রা। মনসহিত ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম বিষয় অহংকার, অহংকারের মহতত্ত্ব এবং মহতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিষয় অর্থাৎ কারণ হল প্রকৃতি। এরপরে আর কোনো সূক্ষ্ম পদার্থ নেই, এখানেই সূক্ষ্মতার শেষ সীমা। অতএব মনে রাখতে হবে যে, প্রকৃতির যে কোনো সূক্ষ্ম পদার্থকে লক্ষ্য করে যে সমাধি তা সবিচার ও নির্বিচার সমাধির অন্তর্গত। যদ্যপি পুরুষ প্রকৃতি থেকেও সূক্ষ্ম, কিন্তু তা দৃশ্য পদার্থের অন্তর্গত নয়। সেইজন্য তদ্‌বিষয়ক সমাধি এর ভিতরে আসবে না, তথাপি গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধি বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষে করা যেতে পারে (যোগ. ৩।৩৫)। অতএব তাকে নির্বিচার সমাধির অন্তর্গত ধরে নিলে আপত্তির কোনো কারণ থাকে না। কেননা কঠোপনিষদে (১।৩।১০) জীবাত্মা থেকে প্রকৃতিকে 'পর' (অতীত) বলা হয়েছে।

এইভাবে এখানে সূক্ষ্ম বিষয়ের সীমা প্রকৃতি পর্যন্ত জানানোর ফলে মন, ইন্দ্রিয় তথা আনন্দ ও অস্মিতার এতে অন্তর্ভাব প্রতীত হয়, কিন্তু ১৭ নং সূত্রে বর্ণিত আনন্দ ও অস্মিতাকে এবং ৪১ নং সূত্রে 'গ্রহণ' নামে কথিত মন ও ইন্দ্রিয়কে এবং 'গ্রহীতা' নামে কথিত প্রকৃতিস্থ পুরুষকে টীকাকারগণ বিচার শব্দবাচ্য সূক্ষ্ম বিষয় থেকে কীভাবে পৃথক বলেছেন এবং সূত্রকারগণ তদ্বিবষয়ক সমাধির ভেদের বর্ণনা কেন করেননি তা বিচারণীয়॥ ৪৫ ॥

সম্বন্ধ—*৪১ নং সূত্র থেকে ৪৫ নং সূত্র পর্যন্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভেদ বর্ণনা করে—এখন ওইসব সমাধির সহেতুক অন্য নামের বর্ণনা করছেন :*

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

তা এব=ওইগুলো সমস্তই ; **সবীজঃ**=সবীজ ; **সমাধিঃ**=সমাধি।

ব্যাখ্যা—নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাধি নির্বিকল্প হওয়া সত্ত্বেও নির্বীজ নয়। এসবই সবীজ সমাধি। কারণ বীজরূপে কোনো না কোনো ধ্যেয় পদার্থকে বিষয় করার জন্য বীজরূপে চিত্তবৃত্তির অস্তিত্ব যেন থেকেই যাচ্ছে। অতএব সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হওয়ায় এই সমাধিতে পুরুষের কৈবল্য-অবস্থার লাভ হয় না॥ ৪৬ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত চার প্রকার সমাধির মধ্যে নির্বিচার সমাধিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তা প্রতিপাদন করার জন্য তার বিশেষ অবস্থার বর্ণনা করছেন—*

নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্বিচারবৈশারদ্যে=নির্বিচার সমাধি অত্যন্ত নির্মল হলে পরে (যোগীর) ; **অধ্যাত্মপ্রসাদঃ**=অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—নির্বিচার সমাধির অভ্যাসের দ্বারা যখন যোগীর চিত্তের স্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিপক্কতা লাভ করে এবং তার সমাধি স্থিতিতেও কোনো প্রকারের কিঞ্চিৎমাত্র মলিনতা থাকে না (যোগ. ১।৪০) সেই অবস্থায় যোগী অত্যন্ত নির্মল ও স্বচ্ছ বুদ্ধির অধিকারী হন (যোগ.৩।৫)॥ ৪৭ ॥

সম্বন্ধ—*অনন্তর :*

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

তত্র=সেই সময় (যোগীর) ; **প্রজ্ঞা**=বুদ্ধি ; **ঋতম্ভরা**=ঋতম্ভরা হয়।

ব্যাখ্যা—ওই অবস্থায় যোগীর বুদ্ধি বস্তুর সত্য (ঋত বা প্রকৃত) স্বরূপকে গ্রহণ করে, সেখানে সংশয় ও ভ্রমের লেশমাত্র থাকে না॥ ৪৮ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার বিশেষত্ব বর্ণনা করছেন—*

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ॥ ৪৯ ॥

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যাম্=শ্রবণ ও অনুমান দ্বারা জাত বুদ্ধি অপেক্ষা ; **অন্যবিষয়া**=এই বুদ্ধির বিষয় ভিন্ন ; **বিশেষার্থত্বাৎ**=কেননা এইটি বিশেষ অর্থবহ।

ব্যাখ্যা—বেদ, শাস্ত্র ও আপ্ত পুরুষের বচনের দ্বারা বস্তুর সামান্য জ্ঞান হয়, পূর্ণ জ্ঞান হয় না। একইভাবে অনুমানের দ্বারা সাধারণ জ্ঞান হয়, এমনকি অনেক সূক্ষ্ম পদার্থে অনুমান পৌঁছাতে পর্যন্ত পারে না। সেইজন্য বেদশাস্ত্রে কোনো বস্তুর স্বরূপের বর্ণনা শোনার পর তদ্‌বিষয়ক যে নিশ্চয়তা জন্মায় তা হল শ্রুতবুদ্ধি। অনুমান (যুক্তি) দ্বারা যে বস্তুর স্বরূপের নিশ্চয়তা জন্মায়, তা হল অনুমান বুদ্ধি। এই দুটি বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বস্তুর স্বরূপকে সামান্যরূপে জানা যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ তার পূর্ণ জ্ঞান এর দ্বারা হয় না। কিন্তু ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা বস্তুর স্বরূপের যথার্থ ও পূর্ণ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহিত) জ্ঞান লাভ হয়। সেইজন্য তা ওই দুই প্রকার বুদ্ধি (শ্রুতবুদ্ধি ও অনুমান বুদ্ধি) থেকে ভিন্ন এবং তা সর্বশ্রেষ্ঠ॥ ৪৯ ॥

সম্বন্ধ—*এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আরও মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন :*

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী॥ ৫০ ॥

তজ্জঃ=তা থেকে উৎপন্ন হওয়া ; **সংস্কারঃ**=সংস্কার ; **অন্যসংস্কার প্রতিবন্ধী**=অন্য সংস্কারসমূহকে বাধিত করে।

ব্যাখ্যা—মানুষ যা কিছু অনুভব করে, যা কিছু ক্রিয়া করে—সে-সবই সংস্কাররূপে তার অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে। যোগশাস্ত্রে একেই কর্মাশয় (যোগ. ২।১২) নামে বলা হয়েছে। এই হল মানুষের সংসার চক্রে গমনা-গমনের মূল কারণ (যোগ ২।১৩) এবং এর বিনাশেই মানুষের মুক্তি অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি। সেইজন্য উক্ত বুদ্ধির (ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা) মহত্ত্ব প্রকট করতে গিয়ে সূত্রকার বলছেন যে, এই বুদ্ধি উদিত হলে যখন মানুষের প্রকৃতির যথার্থ স্বরূপের (অর্থাৎ পাঁচ তত্ত্বের প্রকৃতি যার স্বরূপ দ্বন্দ্বময়) জ্ঞান হয় তখন তার প্রকৃতি ও তার কার্যে স্বভাবতই বৈরাগ্য

আসে। ওই বৈরাগ্যের সংস্কার পূর্বের জমে থাকা সমস্ত রাগ-দ্বেষময় সংস্কারকে ভস্ম করে দেয় (যোগ. ২।২৬, ৩।৪৯-৫০)। এর ফলে যোগী শীঘ্রই মুক্তাবস্থায় পৌঁছে যায় ॥ ৫০ ॥

সম্বন্ধ——*এখন নির্বীজ সমাধিরূপ কৈবল্য অবস্থার বর্ণনা করে এই পাদের সমাপ্তি করছেন :*

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

তস্য=তার ; **অপি**=ও ; **নিরোধে**=নিরোধ হওয়ার ফলে ; **সর্বনিরোধাৎ**=সব কিছুর নিরোধ হয়ে যাওয়ার জন্য ; **নির্বীজঃ**=নির্বীজ ; **সমাধিঃ**=সমাধি (হয়)।

ব্যাখ্যা—যখন ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারের প্রভাবে সমস্ত রকম সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়, তখন ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা উৎপন্ন সংস্কারের প্রতিও আসক্তি না থাকায় তারও নিরোধ হয়ে যায়। এই নিরোধের ফলে সমস্ত সংস্কারেরই স্বাভাবিক নিরোধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সংস্কারের বীজটি পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভস্ম হয়ে যায়। এটি হল নির্বীজ সমাধি, যাকে কৈবল্য অবস্থাও বলা হয় (যোগ. ৩।৫০)॥ ৫১ ॥



॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

সাধনপাদ——২

সম্বন্ধ——*পূর্বের পাদে যোগের স্বরূপ, তার ভেদ ও ফলের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তৎসহ তার উপায়ভূত অভ্যাস ও বৈরাগ্য তথা ঈশ্বর প্রণিধান ইত্যাদি অন্য সাধনের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে বর্ণিত রীতি অনুসরণে নির্বীজ সমাধি কেবলমাত্র সেই সাধকই লাভ করতে পারেন, যাঁর অন্তঃকরণ স্বভাবতই শুদ্ধ এবং যিনি যোগের সাধনায় তৎপরভাবে নিমগ্ন। এখন তাই সাধারণ সাধকের জন্য ক্রমশঃ অন্তঃকরণশুদ্ধিপূর্বক নির্বীজ সমাধি লাভ করার উপায় বর্ণনা করার জন্য সাধনপাদ নামক দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করা হচ্ছে—*

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি=তপ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বর প্রণিধান—এই তিনটি ; **ক্রিয়াযোগঃ**=ক্রিয়াযোগ।

ব্যাখ্যা——(১) তপ——নিজ বর্ণ-আশ্রম-পরিস্থিতি ও যোগ্যতা অনুসারে স্বধর্মের পালন করা এবং পালনের পথে যে যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেখা দেয় তাকে সহর্ষে সহ্য করা হল——'তপ'। ব্রত-উপবাস ইত্যাদি এরই অন্তর্গত। নিষ্কামভাবে এই তপ পালনের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ অনায়াসেই শুদ্ধতা লাভ করে। এইটি গীতায় উক্ত কর্মযোগেরই অঙ্গ।

(২) স্বাধ্যায়——যার দ্বারা আপন কর্তব্য-অকর্তব্যের বোধ জন্মে, বেদ-শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের বাণীর পঠন-পাঠন, ঈশ্বরের নাম-জপ অথবা ওঁ-

কার অথবা কোনো নামের জপ, গায়ত্রী মন্ত্র জপ অথবা নিজ ইষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করা হল—'স্বাধ্যায়'। এছাড়া নিজ জীবনের অধ্যয়ন অর্থাৎ সাধক যে 'বিবেক-বিচার' প্রাপ্ত হয়েছেন তার দ্বারা নিজের দোষগুলোকে দূর করার নামও 'স্বাধ্যায়'।

(৩) ঈশ্বর প্রণিধান—ঈশ্বরের শরণাগত হওয়ার নাম 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। তাঁর নাম-রূপ-লীলা-ধাম(বৈকুণ্ঠাদি)-গুণ-প্রভাব ইত্যাদির শ্রবণ-কীর্তন-মনন করা, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, নিজেকে ভগবানের হাতের যন্ত্র করে তোলা অর্থাৎ যেভাবে তিনি চালান তেমনি চলা, তাঁর আজ্ঞাপালন করা ও তাঁর প্রতি প্রেমে অনন্যভাবে নিমগ্ন থাকা—এ সমস্তই হল ঈশ্বর প্রণিধানের অঙ্গ।

তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান—এই তিনটি যম, নিয়ম ইত্যাদি যোগাঙ্গ সমূহের মধ্যে নিয়মের অন্তর্গত। তথাপি এই তিনটি সাধনের বিশেষ মহত্ত্ব ও তার সুগমতা দেখানোর জন্যই প্রথমে 'ক্রিয়াযোগ' নাম দিয়ে তার আলাদা বর্ণনা করা হয়েছে॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*উপরিউক্ত ক্রিয়াযোগের ফল বলছেন—*

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ॥ ২ ॥

সমাধিভাবনার্থঃ=(এই ক্রিয়াযোগ) সমাধিতে সিদ্ধি আনে ; চ=এবং ; **ক্লেশতনূকরণার্থঃ**=অবিদ্যাদি ক্লেশকে ক্ষীণ করে।

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত ক্রিয়াযোগ অবিদ্যাদি দোষকে ক্ষীণ করে ও সমাধিতে সিদ্ধি আনে অর্থাৎ এই (ক্রিয়াযোগ) সাধনের দ্বারা সাধকের অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এমনকি যোগীর কৈবল্য অবস্থা পর্যন্ত সমাধির প্রাপ্তি সম্ভব হতে পারে॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*দ্বিতীয় সূত্রে ক্রিয়াযোগের ফল হিসাবে ক্লেশনাশ ও সমাধিসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সমাধির লক্ষণ ও ফলের বর্ণনা পূর্বের পাদে করা হয়েছে। কিন্তু ক্লেশের ভেদ, তার নাম এবং তা কোন কোন অবস্থায় থাকে, কীভাবে তার ক্ষয় হয় এবং কেন তার নাশ করা উচিত—*

এ সমস্ত সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়নি। সেজন্য প্রসঙ্গানুসারে এই প্রকরণের আরম্ভ করা হচ্ছে—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ।। ৩ ।।

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ=অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (এই পাঁচটি) হল ; **ক্লেশাঃ**=ক্লেশ।

ব্যাখ্যা—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ—এই পাঁচটিই জীব মাত্রকে সংসারচক্রে আবর্তিত করে এবং মহাদুঃখদায়ক। এজন্য সূত্রকার এর নাম দিয়েছেন '**ক্লেশ**'।

অনেক টীকাকার বলেন যে এই পাঁচটি ক্লেশ হল পাঁচ প্রকার বিপর্যয় জ্ঞান। এদের মধ্যে অনেকে আবার কেবলমাত্র অবিদ্যাকে বিপর্যয় বৃত্তির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন ; কিন্তু এই দুটি মতই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। কারণ প্রমাণ বৃত্তিতে বিপর্যয় বৃত্তি থাকে না, কিন্তু অবিদ্যাদি পাঁচ ক্লেশ সেখানেও বর্তমান থাকে। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞায় বিপর্যয়ের লেশমাত্র স্বীকার করা হয় না অথচ যে অবিদ্যারূপ ক্লেশকে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে সংযোগের হেতু বলে মানা হয় তা তো সেখানেও থেকে যায়, অন্যথা সংযোগের অভাবে হেয় পদার্থের নাশ হয়ে সাধকের সেই মুহূর্তেই কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আরও একটা কথা আছে। এই গ্রন্থে কৈবল্য স্থিতি প্রাপ্ত সিদ্ধ যোগীর কর্ম অশুক্ল ও অকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্য-পাপের সংস্কাররহিত বলে মানা হয়েছে (যোগ ৪।৭)। এর থেকে এটাই সিদ্ধ হয় যে জীবন্মুক্ত যোগীর দ্বারাও কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্যই হয়ে থাকে। তাহলে এটাও মেনে নিতে হবে যে ব্যুত্থিত অবস্থায় যখন তিনি কর্ম করেন তখন স্বভাবতই বিপর্যয় বৃত্তির প্রাদুর্ভাব থাকতেই পারে। কারণ পাঁচ বৃত্তিই হল চিত্তের ধর্ম এবং ব্যুত্থিত অবস্থায় চিত্ত বিদ্যমান থাকে—এটি স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু জীবন্মুক্ত যোগীর মধ্যে অবিদ্যার বিদ্যমানতা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, যদি অবিদ্যা থাকে তাহলে তিনি জীবন্মুক্ত হন কী করে ? এরকম আরও অনেক কারণ আছে (যোগ. ১।৮-এর টীকা দ্রষ্টব্য)। যার জন্য অবিদ্যা ও

বিপর্যয়ের একতা মেনে নিলে সিদ্ধান্তের হানি হয়। অতএব বিদগ্ধজন এর বিচার করবেন॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ—*এখন ক্লেশগুলির অবস্থার বিভিন্ন প্রকার ভেদ নির্দেশ করে তার মূল কারণ হিসাবে অবিদ্যারূপ ক্লেশকে নির্দেশ করছেন*—

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্॥ ৪ ॥

প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্=যা প্রসুপ্ত (লীন), তনু (সূক্ষ্ম), বিচ্ছিন্ন (বিচ্ছেদপ্রাপ্ত) এবং উদার (পরিপূর্ণ)—এই চার অবস্থা (অবিদ্যারূপ ক্লেশের মূল কারণ)-তেই বিদ্যমান এবং **উত্তরেষাম্**=যাদের বর্ণনা (৩নং সূত্রে) অবিদ্যার পরে করা হয়েছে সেগুলির (অস্মিতাদি চারটি ক্লেশের) ; **ক্ষেত্রম্**=কারণ ; **অবিদ্যা**= অবিদ্যা ।

ব্যাখ্যা—(১) প্রসুপ্ত—চিত্তে (বীজরূপে) বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ওই ক্লেশ যখন কার্যকরী হয় না তখন তাকে প্রসুপ্ত বলা হয়। যেমন—বীজমধ্যে বৃক্ষশক্তি প্রসুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। প্রলয়কাল ও সুষুপ্তিতে চারটি ক্লেশই প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকে।

(২) তনু—ক্লেশের মধ্যে যে কার্যশক্তি আছে, যোগ-সাধনের দ্বারা সেই কার্যশক্তিকে যখন হ্রাসপ্রাপ্ত করা হয় তখন সেই ক্ষীণ শক্তিযুক্ত ক্লেশকে বলা হয় 'তনু'। যেমন—রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ সাধারণ মানুষের মতো সাধকের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অপেক্ষা সাধকের ওপর এর প্রভাব অনেক কম পড়ে।

(৩) বিচ্ছিন্ন—যখন কোনো ক্লেশ উদার হয়, সেই সময় অপর ক্লেশ দমিত হয়ে থাকে—তা হল তার 'বিচ্ছিন্নাবস্থা'। যেমন—রাগের উদার অবস্থায় দ্বেষ দমিত হয় অথবা দ্বেষের উদার অবস্থাকালে রাগ দমে যায়।

(৪) উদার—যে সময় যে ক্লেশ নিজ কার্য পূর্ণভাবে করে চলেছে, সেইসময় তাকে 'উদার' বলা হয়।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার ক্লেশের মধ্যে অস্মিতাদি চার ক্লেশেরই প্রসুপ্তাদি চার অবস্থাভেদের কথা বলা হয়েছে, অবিদ্যার নয়। কারণ অবিদ্যা হল অন্য চারটির কারণ। অবিদ্যার নাশ হলে সমূলে সবকিছু চিরকালের জন্য নাশ

হয়ে যায়॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ——*এখন অবিদ্যার স্বরূপ বলছেন—*

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা॥ ৫ ॥

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু=অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্ম পদার্থে ; **নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিঃ**=যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মভাব (আমি ও আমার)-এর অনুভূতি বা জ্ঞান হল ; **অবিদ্যা**=অবিদ্যা।

ব্যাখ্যা——ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত ভোগ ও ভোগের আয়তন এই মনুষ্য শরীর——সবই অনিত্য। এই কথাটি প্রত্যক্ষ রূপে মানুষ উপলব্ধিও করে। কিন্তু তবুও মানুষ যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি করে এবং রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির বশবর্তী হয়, তাই হল অবিদ্যা।

মনুষ্য শরীর হাড়-মাংস-মজ্জা-অস্থি ইত্যাদি অপবিত্র ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত। একই ধাতুর তৈরি স্ত্রী-পুরুষের শরীরকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অপবিত্র অশুচি জেনেও মানুষ আপন শরীরে পবিত্রতার অভিমান করে এবং স্ত্রী-পুত্র-স্বামী প্রভৃতির শরীরকে ভালোবাসে। এ হল অপবিত্রে পবিত্রের অনুভূতিরূপ অবিদ্যা।

ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় সমস্ত ভোগ হল দুঃখরূপ——বিচারশীল সাধক তা উপলব্ধি করেন (যোগ. ২।১৫)। কিন্তু তবুও মানুষ ওই সমস্ত ভোগকে সুখদায়ক বলে মনে করে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয়——এ হল দুঃখে সুখের অনুভূতিরূপ অবিদ্যা।

আবার একটু বিচার করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, এ জড় শরীর (যা অপবিত্র ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত) আত্মা নয়। তথাপি মানুষ এই শরীরকে আপন বা আপন স্বরূপ বলে মনে করে। অথচ আত্মা শরীর হতে সম্পূর্ণ অসঙ্গ ও চৈতন্যস্বরূপ——এটি অনুভব করতে সমর্থ হয় না। এ হল অনাত্মায় আত্মভাবের অনুভূতিরূপ অবিদ্যা।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-প্রমাণের দ্বারা বস্তুস্থিতির সামান্য জ্ঞান হয়ে গেলে বিপর্যয় বৃত্তি আর থাকে না। তথাপি অবিদ্যার নাশ হয় না। এতে সিদ্ধ

হয় যে চিত্তের বিপর্যয় বৃত্তির নাম অবিদ্যা নয়॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ——*এখন অস্মিতার স্বরূপ বলছেন—*

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোঃ=দৃক্-শক্তি ও দর্শন-শক্তি—এই দুইটির ; **একাত্মতা ইব**=যেন একরূপ হয়ে যাওয়া ; **অস্মিতা**=হল অস্মিতা।

ব্যাখ্যা—দৃক্-শক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ এবং দর্শন-শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব—এই দুটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং বিলক্ষণ। দ্রষ্টা চেতন এবং বুদ্ধি জড়। এদের একতা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তথাপি অবিদ্যার কারণে দুটিকে এক বলে মনে হয় (যোগ. ২।২৪)। একেই বলা হয় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ। একেই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপের উপলব্ধির হেতু বলেও মনে করা হয় (যোগ. ২।২৩)। এই সংযোগ থাকা সত্ত্বেও পুরুষ ও বুদ্ধির স্বরূপ যে ভিন্ন তা বুঝতে পারা যায়—বিচারের দ্বারা এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধির দ্বারা। কিন্তু নির্বীজ সমাধির দ্বারা যতক্ষণ না অবিদ্যার সম্পূর্ণরূপে নাশ হয়, ততক্ষণ সংযোগের অভাব হয় না। সেইজন্য সাধকের শুদ্ধ স্বরূপেরও অনুভব হয় না (যোগ. ৩।৩৫)। অতএব সাধকের কর্তব্য হল তৎপর হয়ে উৎসাহভরে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে অবিদ্যাকে বিনষ্ট করে সংযোগরূপ অস্মিতা নামক ক্লেশের নাশ করে কৈবল্য-স্থিতিকে প্রাপ্ত হওয়া॥ ৬॥

সম্বন্ধ——*এখন 'রাগ' নামক ক্লেশের স্বরূপ বলছেন—*

সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

সুখানুশয়ী=সুখের প্রতীতির পেছনে থাকা ক্লেশ ; **রাগঃ**=রাগ।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতিস্থ জীবের যখন কোনো অনুকূল পদার্থে সুখের প্রতীতি হয় তখন তাতে এবং তার নিমিত্তসমূহেও তার আসক্তি জন্মায় একেই বলা হয় 'রাগ'। সেইজন্য রাগ নামক ক্লেশকে সুখের প্রতীতির সঙ্গী বলা হয়॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ——*এখন 'দ্বেষ' নামক ক্লেশের স্বরূপ বলছেন—*

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

দুঃখানুশয়ী=দুঃখের প্রতীতির পশ্চাতে থাকা ক্লেশ ; **দ্বেষঃ**=দ্বেষ।

ব্যাখ্যা—মানুষের যখন কোনো প্রতিকূল পদার্থে দুঃখের প্রতীতি হয় তখন সেই পদার্থের এবং তার নিমিত্তের প্রতি দ্বেষ জন্ম নেয়। সেইজন্য এই দ্বেষরূপ ক্লেশ দুঃখের প্রতীতির পিছনে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*এখন 'অভিনিবেশ' নামক ক্লেশের কথা বলছেন*—

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

স্বরসবাহী=পরম্পরাগত স্বভাববশে যা চলে আসছে এবং ; **বিদুষঃ অপি তথারূঢ়ঃ**=বিবেকশীল পুরুষের মধ্যেও যা মূঢ় মানুষের মতো বিদ্যমান দেখা যায় তা (মরণভয়রূপ ক্লেশ) ; **অভিনিবেশঃ**=হল অভিনিবেশ।

ব্যাখ্যা—অনাদিকাল থেকে মরণভয়রূপ ক্লেশ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সহজাত। কোনো জীবই চায় না যে 'আমি থাকব না', সকলেই আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চায়। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর প্রাণীও মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে নিজেকে রক্ষার উপায় খোঁজে। (এর দ্বারা পূর্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। কারণ মরণরূপ দুঃখ যদি সে পূর্বে অনুভব করে না থাকে তাহলে কেমন করে সে ভীত হয় ?) জীবের অন্তঃকরণে এই মৃত্যুভয় এত গভীরে থাকে যে অজ্ঞান মানুষের মতো বিবেকশীল ব্যক্তির উপরও এর প্রভাব পড়ে। সেইজন্য এর নাম 'অভিনিবেশ' অর্থাৎ যা 'অত্যন্ত গভীরে প্রবিষ্ট' হয়ে থাকে॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ—*এই পাঁচ প্রকার ক্লেশকে তনু অর্থাৎ সূক্ষ্ম করার সাধনা—'ক্রিয়াযোগ' পূর্বেই বলা হয়েছে। 'ক্রিয়াযোগ' দ্বারা সূক্ষ্মীকৃত ক্লেশের নাশ কীভাবে করা উচিত এখন তা বলা হচ্ছে।*

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

তে=ওই ; **সূক্ষ্মাঃ**=সূক্ষ্মাবস্থা-প্রাপ্ত (ক্লেশ) ; **প্রতিপ্রসবহেয়াঃ**=চিত্তকে আপন কারণে বিলীন করার সাধনদ্বারা নষ্ট করা যায়।

ব্যাখ্যা—ক্রিয়াযোগ বা ধ্যানযোগের মাধ্যমে সূক্ষ্মীকৃত ক্লেশের নাশ করা যায় নির্বীজ সমাধির দ্বারা অর্থাৎ চিত্তকে কারণে বিলীন করতে হবে। ক্রিয়াযোগ বা ধ্যানদ্বারা ক্লেশকে ক্ষীণ করা গেলেও লেশমাত্র ক্লেশের রেশ

থেকে যায়। তার নাশ সম্ভব হয় দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের গ্রন্থি ছেদনে। এর আগে সম্পূর্ণ ক্লেশের নাশ সম্ভব নয়॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ—*এখন ক্লেশকে ক্ষীণ করার জন্য ক্রিয়াযোগের অতিরিক্ত অন্য সাধনের কথা বলছেন :*

ধ্যানহেয়াস্তদ্‌বৃত্তয়ঃ॥ ১১ ॥

তদ্‌বৃত্তয়ঃ=ওইসব ক্লেশের (স্থূল) বৃত্তিসকল ; **ধ্যানহেয়াঃ**=ধ্যানদ্বারা নাশ যোগ্য।

ব্যাখ্যা—সমস্ত ক্লেশের স্থূল বৃত্তিগুলো যদি ক্রিয়াযোগ দ্বারা নাশ করে সূক্ষ্ম করা না হয়ে থাকে তাহলে ধ্যানের দ্বারা স্থূল বৃত্তিগুলো নাশ করে সূক্ষ্ম করে নেওয়া উচিত। তখনই নির্বীজ সমাধির সিদ্ধিতে সুগমতা আসবে। এরপর নির্বীজ সমাধিতে ক্লেশের সর্বথা নাশ নিজে নিজেই হয়ে যাবে॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ—*উপরিউক্ত ক্লেশ জীবের কী ভয়ংকর দুঃখের কারণ হয় তা স্পষ্ট করার জন্য আলাদা প্রকরণ আরম্ভ করা হচ্ছে :*

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ॥ ১২ ॥

ক্লেশমূলঃ=ক্লেশমূলক ; **কর্মাশয়ঃ**=যাবতীয় কর্মসংস্কার ; **দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ**=দৃষ্ট (বর্তমান শরীরদ্বারা) এবং অদৃষ্ট (জন্মান্তরীয় শরীর-দ্বারা) অবশ্যই ভুগতে হয়।

ব্যাখ্যা—উপরিউক্ত পাঁচ ক্লেশই হল কর্মসংস্কারের মূল। অবিদ্যাদি ক্লেশ নাশ হওয়ার পর যে সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হয় সেইসব কর্মের দ্বারা আর কর্মাশয় (কর্মবীজ) তৈরি হয় না বরং রাগ-দ্বেষরহিত নিষ্কাম কর্ম পূর্ব সঞ্চিত কর্মাশয়কেই নাশ করে (গীতা ৪।২৩)। এই ক্লেশমূল কর্মাশয় যেভাবে এইজন্মে দুঃখ প্রদান করে তেমনি পরজন্মেও দুঃখদায়ক হয়। অতএব সাধককে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জন্মের ভোগকে তার মূলসহ ছেদন করতে হবে অর্থাৎ পূর্বোক্ত ক্লেশের সর্বাঙ্গীণ নাশ করতে হবে॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ—*কতদিন পর্যন্ত এই কর্মাশয়ের ফল বজায় থাকে এবং তা*

কেমন এটি স্পষ্ট করছেন :

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

মূলে সতি=মূল বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত ; **তদ্বিপাকঃ**=তার (কর্মাশয়) পরিণাম ; **জাত্যায়ুর্ভোগাঃ**=পুনর্জন্ম, আয়ু ও ভোগ হতে থাকবে।

ব্যাখ্যা—যতদিন পর্যন্ত ক্লেশরূপ মূল বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্যন্ত ওই কর্মাশয়ের বিপাক বা পরিণাম থাকবেই। সেইজন্য ভালো-মন্দ যোনিতে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হবে এবং সেখানে নির্দিষ্ট আয়ু পর্যন্ত বেঁচে থেকে পুনরায় মরণরূপ দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং জীবিত অবস্থাতে বিবেক-বিচারের দ্বারা দুঃখরূপ জেনেও সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন—এই তিনটি হতে থাকবে। ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*সেই জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ পরিণাম কী ধরনের হয় তা বলছেন :*

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

তে=সেগুলি (জন্ম, আয়ু ও ভোগ) ; **হ্লাদপরিতাপফলাঃ**=হর্ষ (আহ্লাদ) ও শোকরূপ (পরিতাপময়) ফলদায়ক ; **পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ**=কেননা তার পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম—দুই-ই হল কারণ।

ব্যাখ্যা—যে জন্ম পুণ্যকর্মের পরিণাম তা সুখদায়ক এবং যে জন্ম পাপকর্মের পরিণাম তা দুঃখদায়ক। এইভাবে আয়ুর যতটা সময় শুভকর্মের পরিণাম ততটা সময় সুখদায়ক হয় আর যতটা সময় পাপকর্মের পরিণাম ততটা সময় দুঃখদায়ক হয়। একইভাবে যে যে ভোগ অর্থাৎ সাংসারিক মানুষ, অন্য প্রাণী, পদার্থ, ক্রিয়া, পরিস্থিতি ইত্যাদির সংযোগ-বিয়োগ পুণ্যকর্মের পরিণাম তা হর্ষপ্রদ হয় বা আহ্লাদময় হয়। তেমনি পাপকর্মের পরিণাম শোকপ্রদ হয় বা পরিতাপময় হয়॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ—*এখানে শঙ্কা দেখা দেয় যে দুঃখদায়ক (জন্ম, আয়ু, ভোগ) কর্মাশয়ের মূলসহ ছেদন করা উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু সুখদায়ক কর্মাশয়কে*

নাশ করতে বলছেন কেন ?—এর উত্তরে বলছেন :

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈঃ=পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ—এই তিনটি দুঃখ সবকিছুতে বিদ্যমান থাকার জন্য ; **চ**=এবং ; **গুণবৃত্তিবিরোধাৎ**=তিনটি গুণের বৃত্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধের কারণে ; **বিবেকিনঃ**=বিবেকীর পক্ষে ; **সর্বম্**=সমস্ত (কর্মফল) ; **দুঃখম্ এব**=হল দুঃখরূপ।

ব্যাখ্যা—(১) **পরিণামদুঃখ**—যে কর্মবিপাক (কর্মফল) ভোগকালে স্থূলদৃষ্টিতে সুখদায়ক মনে হয়, পরিণামে তা-ও দুঃখদায়ক হবেই। যেমন—স্ত্রী-সহবাসকালে সুখ অনুভূত হয় বটে কিন্তু পরিণামে বল, বীর্য, স্মৃতি, তেজ ইত্যাদি হ্রাস প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। এইরকমেই উপলব্ধি করতে হবে যে অন্যান্য ভোগের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।[১]

ভোগ্য পদার্থসমূহ ভোগ করতে করতে একসময় মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার মধ্যে আর ভোগ করার শক্তি থাকে না, কিন্তু তৃষ্ণা থেকে যায়। অতএব ওই ভোগরূপ সুখ প্রকৃতপক্ষে দুঃখরূপ-ই বটে। ভোগের অন্তে অনুভূত হওয়া এই দুঃখ হল পরিণাম-দুঃখের অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দ্রিয় ও পদার্থের সঙ্গে সংযোগের ফলে মানুষের মধ্যে যে কোনো ধরনের সুখের প্রতীতি দেখা দিলে সেখানে রাগ বা আসক্তি হতে বাধ্য। সুতরাং সেই সুখ রাগ (আসক্তি) রূপ ক্লেশের থেকে জাত। আসক্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ সেই ভোগের প্রাপ্তির জন্য ভালো-মন্দ কর্মের অনুষ্ঠানও

[১]গীতাতেও বলা হয়েছে—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ (১৮।৩৮)

যে-সুখ বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে হয়, যা প্রথমে ভোগকালে অমৃতবৎ মনে হলেও পরিণামে বিষতুল্য—সেই সুখকে রাজস সুখ বলা হয়।

অবশ্যই করবে। ভোগ্যবস্তুর প্রাপ্তিতে অসমর্থ হলে অথবা বিঘ্ন এলে দ্বেষও অবশ্যই উৎপন্ন হবে। এছাড়াও প্রাণি-হিংসা ছাড়া ভোগের সিদ্ধি হয় না। সেইজন্য রাগ-দ্বেষ-হিংসা ইত্যাদির পরিণাম অবশ্যই দুঃখ। এটিই হল পরিণাম দুঃখ।

(২) **তাপ দুঃখ**—সমস্ত ধরনের ভোগরূপ সুখ হল বিনাশশীল, তার থেকে বিচ্ছেদ বা বিয়োগ নিশ্চিত। অতএব ভোগকালেও সেটির বিনাশের সম্ভাবনার ভয় এবং তার ফলে তাপদুঃখও বজায় থাকে। একইভাবে মানুষের যে সুখদায়ক ভোগের প্রাপ্তি ঘটে তা অবশ্যই সীমিত হয় অর্থাৎ সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তার থেকে বেশি প্রাপ্তি অন্যের হলে সে ঈর্ষ্যাকাতর হয় এবং ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলতে থাকে—এটাও তাপদুঃখ। ভোগের অপূর্ণতায় ভোগকালে যে সন্তাপ থাকে—তাও তাপদুঃখ।

(৩) **সংস্কার দুঃখ**—যে সমস্ত ভোগের ফলে সুখানুভূতি হয়, সেই অনুভবের সংস্কার তার হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে। কোনো কারণে যখন সেই ভোগ্যবস্তু মানুষের আয়ত্তে থাকে না তখন থাকে কেবল সুখস্মৃতি। ওই সুখস্মৃতি ভীষণ দুঃখ হয়ে দেখা দেয়। বাস্তবেও দেখা যায় যে যখন কোনো মানুষের স্ত্রী-পুত্র-ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর বিনাশ হয়, তখন সেই বিনাশের ব্যথা মানুষকে ব্যাকুল করে তোলে। স্ত্রীর সঙ্গ-সুখ, ধন-সম্পত্তি ভোগ করার সুখ থেকে বঞ্চিত মানুষ বিলাপ করে বেড়ায়। এছাড়াও ভোগ-সংস্কার আসক্তির বৃদ্ধিকারী হওয়ার জন্য শুধু তা এজন্মে নয়, জন্মান্তরেও দুঃখের হেতু হয়।

(৪) **গুণবৃত্তিবিরোধ**—গুণের কার্যের নাম গুণবৃত্তি। তিন গুণের কার্য পরস্পর বিরোধী। যেমন সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ-জ্ঞান-সুখ, তমোগুণের কার্য অন্ধকার-অজ্ঞান-দুঃখ। এই বিরোধের জন্য সবসময় একটা দ্বিধা থেকে যায়। সুখ ভোগকালেও শান্তি থাকে না। কারণ তিনগুণ একসাথেই থাকে। সুখ অনুভবকালেও সত্ত্বগুণের প্রধানতা সত্ত্বেও রজোগুণ, তমোগুণ বর্তমান থাকে অর্থাৎ দুঃখ-শোক বিদ্যমান থাকে। অতএব তা দুঃখও বটে। যেমন, ধ্যানের সময় বা সৎসঙ্গের সময় সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থকে, তখন থাকে সাত্ত্বিক সুখ। কিন্তু সেখানেও সাংসারিক স্ফুরণ অর্থাৎ সাংসারিক

বিষয়ের চিন্তার উদয় ও তন্দ্রা ওই সুখে বিঘ্ন আনয়ন করে। তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

উপরিউক্ত পরিণাম দুঃখ, তাপ দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ তথা গুণ-বৃত্তিবিরোধের দ্বারা জাত দুঃখ বিচার দ্বারা বিবেকী পুরুষ উপলব্ধি করেন। সেইজন্য তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত 'কর্মবিপাক' হল দুঃখরূপ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যে ভোগকে সুখরূপে মনে করে, বিবেকশীল মানুষ তাকে দুঃখরূপে দেখেন॥ ১৫ ॥[১]

সম্বন্ধ——*উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জন্ম আয়ু ও ভোগরূপী সমস্ত রকম কর্মবিপাক দুঃখরূপ। অতএব একে সমূলে উৎখাত করা মানুষের কর্তব্য। এখন এদের থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা জানাতে নতুন প্রকরণ আরম্ভ করছেন :*

হেয়ং দুঃখমনাগতম্॥ ১৬ ॥

অনাগতম্=যা এখনও আসেনি অর্থাৎ যা ভবিষ্যতে আসবে ; **দুঃখম্**=দুঃখ ; **হেয়ম্**=হেয় (নষ্ট করার যোগ্য)।

ব্যাখ্যা——পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব দুঃখ ভোগ করা হয়ে গেছে, সেসব নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে গেছে—সে বিষয়ে বিচার করার কিছু নেই। বর্তমানেও যে দুঃখ-ভোগ সহ্য করতে হচ্ছে তাও সময়মতো কেটে যাবে, অতএব তার জন্যও চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু যে দুঃখ এখনও আসেনি, ভবিষ্যতের অপেক্ষায় আছে, যে কোনো উপায়ে তার নাশ করতে হবে। তাকেই 'হেয়' বলা হয়েছে॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধ——*যার নাশ করা হবে তার মূল কারণকে জানতে হবে। মূল*

---

[১]গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২

ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন সমস্ত ভোগই শেষ পর্যন্ত দুঃখের কারণ এবং এগুলির আদি ও অন্ত আছে। সেইজন্য হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান বিবেকশীল ব্যক্তি তাতে রত হন না।

কারণের নাশ হলেই সেটির সম্পূর্ণ নাশ সম্ভব হবে। না হলে তা পুনরায় উৎপন্ন হতে পারে। অতএব উক্ত 'হেয়' পদার্থের হেতু (কারণ) বলছেন :

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ=দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ; **সংযোগঃ**=সংযোগ ; **হেয়হেতুঃ**=(হল) উক্ত 'হেয়'-এর কারণ।

ব্যাখ্যা—সম্ভাব্য দুঃখ—যা বিনাশ করা সম্ভব, যার সম্বন্ধে পূর্বসূত্রে বলা হয়েছে ; তার মূল কারণ হল দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ অর্থাৎ জড়-চেতনের গ্রন্থি-বন্ধন। এই সংযোগের নাশ করা হলে তবেই মানুষ দুঃখ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পেতে পারে। ॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধ—*পূর্ব সূত্রে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও তাদের সংযোগ—এই তিনটির নাম উল্লিখিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমে দৃশ্যের স্বভাব, স্বরূপ ও প্রয়োজন জানাচ্ছেন :*

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলম্=প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি যার স্বভাব ; **ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং**=ভূত ও ইন্দ্রিয়সমূহ যার (প্রকট) স্বরূপ ; **ভোগাপবর্গার্থম্**=(পুরুষের জন্য) ভোগ ও মুক্তি সম্পাদন করাই যার প্রয়োজন, এমন ; **দৃশ্যম্**=হল দৃশ্য।

ব্যাখ্যা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ ও তাদের কার্য অর্থাৎ যা কিছু দেখা হয়, শোনা হয় বা বোধগম্য হয়—তার সমস্ত কিছুই দৃশ্যের অন্তর্গত। সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম স্থিতি অর্থাৎ—প্রকাশ, রজোগুণের মুখ্য ধর্ম—ক্রিয়া (চঞ্চলতা) এবং তমোগুণের মুখ্য ধর্ম স্থিতি অর্থাৎ জড়তা ও সুষুপ্তি ইত্যাদি। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রধান বা প্রকৃতি বলা হয়। এ হল সাংখ্যের মত। অতএব সকল অবস্থায় অনুগত (অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান) তিন গুণের যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিরূপ স্বভাব—তা হল দৃশ্যের স্বভাব।

পাঁচ স্থূল ভূত, পাঁচ তন্মাত্র, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন-বুদ্ধি-অহংকার—এই তেইশ তত্ত্ব হল প্রকৃতির কার্য এবং প্রকৃতির স্বরূপও বটে।

ভোগাসক্ত পুরুষকে আপন স্বরূপ দেখিয়ে ভোগ প্রদান করা এবং মুক্তিকামী যোগীকে দ্রষ্টার স্বরূপ দেখিয়ে মুক্তি প্রদান করা হল দৃশ্যের প্রয়োজন। দ্রষ্টাকে তার নিজ স্বরূপ দেখিয়ে দেওয়ার পর এর আর কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে না অর্থাৎ নিজ স্বরূপকে জানার (আত্ম-উপলব্ধি) পর মানুষের আর কিছু জানার থাকে না (২।২২), তার পক্ষে এই দৃশ্য বা প্রকৃতির লুপ্তি ঘটে ॥ ১৮ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত দৃশ্যের ভেদের বর্ণন নিজ গ্রন্থের পরিভাষায় করছেন :*

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি=বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ—এই চারটি ; **গুণপর্বাণি**=হল (উপরিউক্ত) সত্ত্বাদি গুণের ভেদ (অবস্থা)।

ব্যাখ্যা—(১) বিশেষ—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচ স্থূল ভূত, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও এক মন—ষোলোটি একত্রে হল বিশেষ। এদের দ্বারাই গুণের (তিন গুণ) বিশেষ ধর্মের অভিব্যক্তি (প্রকাশ) হয়। সেইজন্য এদের 'বিশেষ' বলা হয়। 'সাংখ্যকারিকায়' এদের নাম 'বিকার' (সা. কা. ৩)।

(২) অবিশেষ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি হল তন্মাত্র। এদের সূক্ষ্ম মহাভূতও বলা হয়। কারণ এগুলি স্থূল পঞ্চ মহাভূতের কারণ তথা ষষ্ঠ হল 'অহংকার' যা মন ও ইন্দ্রিয়ের কারণ। এই ছয়টির নাম 'অবিশেষ'। এদের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গোচর নয়। সেইজন্য এদের 'অবিশেষ' বলা হয়।

(৩) লিঙ্গমাত্র—উপরিউক্ত বাইশ তত্ত্বের কারণভূত যে মহত্তত্ত্ব যাকে উপনিষদ্ ও গীতায় 'বুদ্ধিতত্ত্ব' নামে বলা হয়েছে (কঠ. ১।৩।১০ ; গীতা ১৩।৫) এখানে তার নাম 'লিঙ্গমাত্র'। কেবল সত্তামাত্রের দ্বারা এর উপলব্ধি হয়, সেইজন্য একে লিঙ্গমাত্র বলা হয়।

(৪) অলিঙ্গ—যাকে [মূল প্রকৃতি (সা.কা.)] তিন গুণের সাম্যাবস্থা বলে মনে করা হয়, যার প্রথম পরিণাম (কার্য) হল মহত্তত্ত্ব, যাকে গীতা ও উপনিষদে 'অব্যক্ত' নামে অভিহিত করা হয়েছে (কঠ. ১।৩।১১, গীতা ১৩।৫) তার নাম 'অলিঙ্গ'। সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত গুণত্রয়ের স্বরূপের প্রকাশ হয় না, এইজন্য প্রকৃতিকে অলিঙ্গ বা চিহ্নরহিত (অব্যক্ত) বলা হয়। এইভাবে চার অবস্থায় বিদ্যমান সত্ত্বাদি গুণই দৃশ্য নামে অভিহিত হয়॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ—*এখন দ্রষ্টার স্বরূপের বর্ণনা করছেন :*

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

দৃশিমাত্রঃ=চেতনমাত্র (জ্ঞানস্বরূপ আত্মা) ; **দ্রষ্টা**=দ্রষ্টা ; **শুদ্ধঃ অপি**= যদিও স্বভাবতঃ সর্বথা শুদ্ধ (নির্বিকার) তথাপি ; **প্রত্যয়ানুপশ্যঃ**=(বুদ্ধির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে) বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ বলে প্রতীত হয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যা—চৈতনমাত্র যাঁর স্বরূপ সেই আত্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ সর্বতোভাবে শুদ্ধ, নির্বিকার। কিন্তু সেই শুদ্ধ স্বরূপ যখন বুদ্ধির সংস্পর্শে আসছে তখন তা বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ হয়ে যাচ্ছে। তখন তাকে 'দ্রষ্টা' বলা হচ্ছে।

বাস্তবে দ্রষ্টা পুরুষ (আত্মতত্ত্ব) সর্বথা শুদ্ধ, নির্বিকার, কূটস্থ, অসঙ্গ। তথাপি প্রকৃতির সঙ্গে এঁর অনাদি সিদ্ধ অবিদ্যাকৃত সম্বন্ধ রয়েছে। যতক্ষণ না অবিদ্যার নাশ হয়ে প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদপূর্বক আপন প্রকৃত স্বরূপে স্থিতি হয়, ততক্ষণ যেন বুদ্ধির সাথে একতা প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধির বৃত্তিগুলো দেখতে থাকেন আর ততক্ষণ তাঁকে 'দ্রষ্টা' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু দৃশ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে কার দ্রষ্টা ? তখন ইনি কেবল চৈতনমাত্র, সর্বথা শুদ্ধ, নির্বিকার ॥ ২০ ॥

সম্বন্ধ—*দৃশ্য ও দ্রষ্টার স্বরূপের বর্ণনা করার পর এখন দৃশ্যের স্বরূপের সার্থকতা প্রতিপাদন করছেন—*

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা ॥ ২১ ॥

দৃশ্যস্য=(উক্ত) দৃশ্যের ; **আত্মা**=স্বরূপ ; **তদর্থঃ এব**=সেই (দ্রষ্টার) জন্যই বর্তমান।

ব্যাখ্যা—দৃশ্যের প্রয়োজন কেন ? উক্ত দ্রষ্টাকে নিজ দর্শনদ্বারা ভোগ প্রদান করা এবং তাঁর নিজ স্বরূপের (আত্মতত্ত্ব) দর্শন করিয়ে অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যই হল দৃশ্য। এতেই তার উৎপত্তির সার্থকতা। ১৮ নং সূত্রে দৃশ্যের লক্ষণের বর্ণনা করতে গিয়ে একথাই বলা হয়েছে॥ ২১ ॥

সম্বন্ধ—*পুরুষকে অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করার পর প্রকৃতির আর কোনো কাজ বাকি থাকে না। তখন তার (প্রকৃতির) অবস্থান নিরর্থক হয়ে যায়। এতদবস্থায় সর্বতোভাবে প্রকৃতির লোপ হয়ে যাওয়া উচিত। এর উত্তরে জানাচ্ছেন :*

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ॥ ২২ ॥

কৃতার্থম্ প্রতি=যার ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) পূর্ণ হয়ে গেছে, সেই পুরুষের জন্য ; **নষ্টম্**=নাশপ্রাপ্ত ; **অপি**=তথাপি (সেই প্রকৃতি) ; **অনষ্টম্**=নষ্ট হয় না ; **তৎ অন্যসাধারণত্বাৎ**=কারণ অন্যের (তখনও যারা মুক্তি পায়নি) জন্য তা সমানভাবে বর্তমান থাকে।

ব্যাখ্যা—কোনো একজনমাত্র পুরুষকে ভোগ ও অপবর্গ প্রদান করার জন্যই যে কেবল প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, সমস্ত পুরুষের জন্যই তা সমান। মুক্ত পুরুষের কাছে তার (প্রকৃতির) প্রয়োজন না থাকায় যদিও তাঁর কাছে তা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছে তবু অবশিষ্ট সকল জীবের ভোগ ও অপবর্গ প্রদান করা তখনও বাকি থাকে । অতএব প্রকৃতির সম্পূর্ণরূপে নাশ কখনো হয় না, তা সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এতে প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতি পরিণামী হওয়া সত্ত্বেও অনাদি ও নিত্য। মুক্ত পুরুষের কাছে প্রকৃতির লোপ হওয়ার কথা বলার তাৎপর্য হল কেবল তার (প্রকৃতির) অদৃশ্য হওয়া। কারণ যোগের সিদ্ধান্তে কোনো বস্তুর সর্বতোভাবে নাশ মেনে নেওয়া হয়নি॥ ২২ ॥

সম্বন্ধ—*এখন সংযোগের স্বরূপের বর্ণনা করছেন—*

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ॥ ২৩ ॥

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ=স্বশক্তি (প্রকৃতি) ও স্বামিশক্তি (পুরুষ)—এই দুইয়ের ; **স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ**=স্বরূপের প্রাপ্তির যে কারণ, তা ; **সংযোগঃ**=হল সংযোগ।

ব্যাখ্যা—দৃশ্যের স্বরূপ হল দ্রষ্টার জন্য—একথা পূর্বে বলা হয়েছে। এই ভাবকে বজায় রেখে এই সূত্রে পুরুষকে প্রকৃতির স্বামী বলা হয়েছে এবং প্রকৃতিকে পুরুষের 'স্ব' অর্থাৎ নিজের বা অধিকৃত পদার্থ বলা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ কেবল এই দুইয়ের স্বরূপকে জানার জন্যই। সেজন্য দর্শন (জ্ঞান) শক্তির দ্বারা যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতির নানা রূপকে দেখে, ততক্ষণ ভোগ করতে থাকে। যখন এইসব দর্শনের প্রতি বিরক্ত হয়ে মানুষ নিজ স্বরূপের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখনই স্বরূপের দর্শন হয় (যোগ. ৩।৫)। তখন আর সংযোগের কোনো আবশ্যকতা না থাকায় তার অভাব হয়ে যায়। এই হল পুরুষের 'কৈবল্য' অবস্থা (যোগ. ৩।৩৮)॥ ২৩ ॥

সম্বন্ধ—*এখন উক্ত সংযোগের কারণ বলছেন :*

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

তস্য=ওই সংযোগের ; **হেতুঃ**=কারণ ; **অবিদ্যা**=হল অবিদ্যা।

ব্যাখ্যা—সদা-সর্বদা নির্বিকার, অসঙ্গ চেতন পুরুষের সঙ্গে জড়-প্রকৃতির যে সম্বন্ধ তা অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যা হতে উৎপন্ন, বাস্তবে তা নেই। নিজ চেতন স্বরূপ ভুলে থাকার মূলে আছে অনাদিসিদ্ধ অজ্ঞান। তারই অন্য নাম 'অবিদ্যা'। যখন নিজ স্বরূপের জ্ঞান হয় অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় তখন ওই অবিদ্যারও নাশ হয়। তারপর আর কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকে না। তখন জ্ঞানও শান্ত হয়ে যায়। এ হল পুরুষের 'কৈবল্য' অবস্থা॥ ২৪ ॥

সম্বন্ধ—*এখন কারণসহ সংযোগের অভাব থেকে যা সিদ্ধ হয়—সেই সর্ব-দুঃখনাশ রূপ 'হান'—এর বর্ণনা করছেন :*

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্॥ ২৫ ॥

তদভাবাৎ=এর (অবিদ্যার) অভাবে ; **সংযোগাভাবঃ**=সংযোগের অভাব (হয় ; এই হল) ; **হানম্**='হান' (পুনর্জন্ম ইত্যাদি পুনঃপুনঃ দুঃখের

অত্যন্ত অভাব) ও ; তৎ=সেই ; দৃশেঃ=হল চেতন আত্মার ; **কৈবল্যম্**= 'কৈবল্য'।

ব্যাখ্যা—যখন আত্মদর্শনরূপ জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের সর্বতোভাবে নাশ হয় তখন অজ্ঞানজনিত সংযোগের অভাবও নিজে থেকেই হয়ে যায়। তখন পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না ; তখন পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণরূপ দুঃখের অন্ত হয় অর্থাৎ পুরুষ আপন স্বরূপে স্থিত হন—এ তাঁর 'কৈবল্য' অবস্থা অর্থাৎ তখন তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়॥ ২৫ ॥

সম্বন্ধ—*এখন দুঃখের অত্যন্ত অভাবরূপ 'হান'-এর উপায় বলছেন :*

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ॥ ২৬ ॥

অবিপ্লবা=নিশ্চল এবং নির্দোষ ; **বিবেকখ্যাতিঃ**=বিবেকজ্ঞান ; **হানোপায়ঃ**=(উক্ত) 'হান'-এর উপায়।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতি তথা তার কার্য—বুদ্ধি-অহংকার-ইন্দ্রিয় এবং শরীর —এদের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হয়ে গেলে তথা আত্মা (এদের থেকে) সম্পূর্ণ অসঙ্গ ও আলাদা, আত্মার সঙ্গে এদের কোনোভাবেই কোনো সম্পর্ক নেই অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ যে স্বরূপতঃ ভিন্ন—সে সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের উদয় হলে, তাকেই বলে 'বিবেকজ্ঞান' (যোগ. ৩।৫৪)। সেই সময় চিত্ত বিবেকজ্ঞানে নিমগ্ন ও কৈবল্য অভিমুখী থাকে। এই জ্ঞান যখন সমাধির নির্মলতা ও স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ ও নিশ্চল হয়ে যায়, সেখানে লেশমাত্র মল থাকে না (যোগ ৪।৩১)—তখন তাকে 'অবিপ্লব বিবেক-জ্ঞান' বলে। এই বিবেকজ্ঞানই সমস্ত সুখ-দুঃখের অত্যন্ত অভাবরূপ মুক্তির উপায়, এর থেকেই সংসারের বীজস্বরূপ সমস্ত অবিদ্যাদি ক্লেশ ও কর্মের ক্ষয়সাধন হয়ে যায় (যোগ. ৪।৩০)। চিত্ত তখন নিজ আশ্রয়রূপ মহত্তত্ত্ব ইত্যাদির সাথে নিজ কারণে বিলীন হয়ে যায়। তখন প্রকৃতির যে স্বাভাবিক পরিণামক্রম—বির্মুক্ত পুরুষের ক্ষেত্রে তখন তা কার্যকরী হয়

না (যোগ. ৪।৩২)॥ ২৬ ॥

সম্বন্ধ——*উক্ত বিবেকজ্ঞানের সময় সাধকের বুদ্ধি কী ধরনের হয় তা বলছেন :*

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা॥ ২৭ ॥

তস্য=সেই (বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত) পুরুষের ; **সপ্তধা**=সাত রকমের ; **প্রান্তভূমিঃ**=অন্তিম স্থিতিযুক্ত ; **প্রজ্ঞা**=বোধোদয় (হয়)।

ব্যাখ্যা——নির্মল ও অচল বিবেকখ্যাতির দ্বারা যোগীর চিত্তের আবরণ ও মল যখন সর্বথা নষ্ট হয়ে যায় (যোগ. ৪।৩১), তখনকার সেই চিত্তে অন্য সাংসারিক জ্ঞানের উদয় হয় না। তখন সাত প্রকার উৎকর্ষময় অবস্থাসম্পন্ন প্রজ্ঞা (বোধ) উৎপন্ন হয়। এদের মধ্যে প্রথম চারটি কার্য বিমুক্তির দ্যোতক। সেইজন্য সেগুলি 'কার্যবিমুক্তিপ্রজ্ঞা' বলা হয়। শেষের তিনটি চিত্তবিমুক্তির দ্যোতক। সেইজন্য তাদের 'চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞা' বলা হয়।

কার্যবিমুক্তি প্রজ্ঞা অর্থাৎ কর্তব্যশূন্য অবস্থার চারটি ভেদ এইরকম——

১) জ্ঞেয়শূন্য অবস্থা——যা কিছু জানার ছিল জানা হয়ে গেছে, আর কিছুই জানার বাকি নেই অর্থাৎ গুণময় যত দৃশ্য আছে (যোগ. ২।১৮, ১৯) সবই অনিত্য, সবই পরিণামী——এটি যথার্থভাবে অবগত হওয়া।

২) হেয়শূন্য অবস্থা——দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ যা কিনা সকলপ্রকার হেয় বা ত্যাজ্যের হেতু তাকে সমূলে নাশ করার পর নাশ করার আর কিছুই অবশেষ থাকে না অর্থাৎ যার অ-ভাব করার প্রয়োজন ছিল, তা করা হয়েছে। এরই নাম হেয়শূন্য অবস্থা।

৩) প্রাপ্যপ্রাপ্ত অবস্থা——যা কিছু পাবার ছিল পেয়ে গেছি। সমাধির দ্বারা কৈবল্য অবস্থার প্রাপ্তি হয়ে গেছে, এখন আর কিছু পাওয়ার বাকি নেই।

৪) চিকীর্ষাশূন্য অবস্থা——যা কিছু করার ছিল, করা হয়ে গেছে——'হান'-এর উপায় যা হল নির্মল, অচল বিবেকজ্ঞান, তা সিদ্ধ হয়ে গেছে——আর কিছু করণীয় বাকি নেই।

চিত্তবিমুক্তি প্রজ্ঞার তিন অবস্থা——

১) চিত্তের কৃতার্থতা——চিত্ত আপন অধিকার 'ভোগ ও অপবর্গ

(মুক্তি)' দেওয়া সম্পন্ন করেছে এখন তার আর কোনো প্রয়োজন বাকি নেই।

২) গুণলীনতা—চিত্ত আপন কারণরূপ গুণে লীন হতে চলেছে। এখন তার (চিত্তের) আর কোনো কাজ বাকি নেই।

৩) আত্মস্থিতি—পুরুষ সম্পূর্ণভাবে গুণাতীত হয়ে আপন স্বরূপে অচলভাবে স্থিত হয়ে গেছে। এখন তার মুক্ত বা কৈবল্য অবস্থা।

এই সাত প্রকারের প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা অনুভবকারী যোগীকে কুশল (জীবন্মুক্ত) বলা হয় এবং চিত্ত যখন আপন কারণে লীন হয়ে যায় তখনও কুশল (বিদেহমুক্ত) বলা হয় ॥ ২৭ ॥

সম্বন্ধ—*এখন উক্ত নির্মল বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তির উপায় বলছেন :*

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাৎ=যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করার ফলে ; **অশুদ্ধিক্ষয়ে**=অশুদ্ধির নাশ হলে ; **জ্ঞানদীপ্তিঃ**=জ্ঞানের প্রকাশ ; **অবিবেকখ্যাতেঃ**=বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—পরবর্তী সূত্রে যোগের যে আটটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে সেগুলির পালনের দ্বারা যখন চিত্তের মল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই মলহীন চিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানের প্রকাশ যোগীকে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত নিয়ে যায়। অর্থাৎ ওই প্রকাশের শেষ সীমা হল বিবেকখ্যাতি (আত্ম-সাক্ষাৎকার)। আত্মা যে সবকিছু থেকে ভিন্ন অর্থাৎ বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্রিয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা যোগী প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন॥ ২৮ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত যোগাঙ্গ সমূহের নাম ও সংখ্যা বলছেন—*

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ো-
ঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ২৯ ॥

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ঃ=যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ; **অষ্টৌ**=এই আটটি ; **অঙ্গানি**=হল (যোগের) অঙ্গ।

ব্যাখ্যা—পরবর্তী সূত্রসমূহে সূত্রকার স্বয়ং এই আটটি যোগের লক্ষণ ও ফলের বর্ণনা করেছেন ॥ ২৯ ॥

সম্বন্ধ—*প্রথমে 'যম'-এর বর্ণনা করছেন :*

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ=অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চৌর্য-বৃত্তির ত্যাগ) ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ (সংগ্রহবৃত্তির অভাব)—এই পাঁচটি ; **যমাঃ**=(হল) যম।

ব্যাখ্যা—১) অহিংসা—কেবল প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করা নয়, কায়-মন-বাক্য দ্বারা কোনো প্রাণীকে কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না দেওয়া হল 'অহিংসা'। পরদোষ দর্শনের সর্বথা ত্যাগও এর অন্তর্গত।

২) সত্য—ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করে—যথার্থভাবে শুনে, যথাযথভাবে অনুমান করে অর্থাৎ যেমন যেমন অনুভূত হয়েছে, ঠিক সেইমতোই ব্যক্ত করা, কোনো কিছু অতিরঞ্জিত না করে বলা, ছল-কপটতার আশ্রয় না নেওয়া, সত্য ও হিতকর বচন যা অন্যের উদ্বেগ উৎপন্ন করে না—সেইপ্রকার বাক্যের নাম 'সত্য'। এই রকমেই ছলনাদি রহিত ব্যবহারের নাম সত্য ব্যবহার।

৩) অস্তেয়—চৌর্যবৃত্তির ত্যাগ। অন্যায়পূর্বক ও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে পরের দ্রব্যকে নিজের করে নেওয়া হল 'স্তেয়' (চুরি)। সরকারি কর ফাঁকি দেওয়া, ঘুষ নেওয়াও এর অন্তর্গত। চিত্তে যখন এই সমস্ত মলের অনস্তিত্ব হয়, তখন তা হয় 'অস্তেয়'।

৪) ব্রহ্মচর্য—মন-বাক্য ও শরীরের দ্বারা কৃত যাবতীয় মৈথুনের সর্বথা ত্যাগ এবং বীর্যরক্ষা করা হল ব্রহ্মচর্য।[১] সেজন্য সাধক কামোদ্দীপক পদার্থের সেবন করবে না, দৃশ্য দেখবে না বা কথা শুনবে না, উত্তেজক

---

(১) কর্মণা মনসা বাচা সর্বাবস্থাসু সর্বদা।
সর্বত্র মৈথুনত্যাগী ব্রহ্মচর্যং প্রচক্ষতে॥
(গরুড়পুরাণ পূর্ব. আচার. ২৩৮।৬)

সাহিত্য পড়বে না। এমনকি মনে পর্যন্ত কামবিষয়ক চিন্তা আনবে না। স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গ আসক্ত পুরুষের সঙ্গও 'ব্রহ্মচর্যে' বাধক। অতএব এই ধরনের সঙ্গ থেকেও সাধক সাবধানতাপূর্বক নিজেকে সরিয়ে রাখবে।

৫) অপরিগ্রহ—নিজ সুখের নিমিত্ত ধন-সম্পত্তি ও ভোগ্যবস্তুর সংগ্রহ করা হল 'পরিগ্রহ'। এটির অভাব হলে হয় 'অপরিগ্রহ'॥ ৩০ ॥

সম্বন্ধ— *উক্ত যম-এর সর্বোচ্চ অবস্থা বলছেন*—

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্॥ ৩১ ॥

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ=(উক্ত যম) জাতি, দেশ, কাল ও নিমিত্তের সীমারহিত ; **সার্বভৌমাঃ**=সার্বভৌম হলে পরে ; **মহাব্রতম্**= মহাব্রত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—উক্ত পঞ্চবিধ যমের অনুষ্ঠান যখন সার্বভৌম অর্থাৎ সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায়, সকল জাতিতে সমানভাবে করা যায় তখন তা মহাব্রত বলে গণ্য হয়। যেমন কেউ যদি এই ব্রত ধারণ করে যে মৎস্য ছাড়া অন্য জীবের প্রতি হিংসা করব না—তখন তা হল জাতি-অবচ্ছিন্ন অহিংসা। তেমনই যদি এই নিয়ম ধারণ করে যে তীর্থস্থানে বা পুণ্যস্থানে হিংসা করব না, তবে তা হল দেশ-অবচ্ছিন্ন অহিংসা। একাদশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় হিংসা করব না—তা হল কালাবচ্ছিন্ন অহিংসা। যদি কেউ ব্রত নেয় যে বিবাহের সময় ছাড়া অন্য কোনো নিমিত্তে হিংসা করব না, তবে তা হল সময়াবচ্ছিন্ন (নিমিত্তের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত) অহিংসা। একইভাবে সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহেরও এইরকম ভেদ বুঝে নিতে হবে। সাধারণভাবে 'যম' ব্রতরূপে কথিত হলেও সার্বভৌম না হলে তা মহাব্রত নয়। যদি পূর্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র বিশেষের নিয়মগুলো আরোপ না করে সকল প্রাণীতে, সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায় তা সমভাবে পালন করা যায়, কোনোভাবেই এতে শিথিলতার অবকাশ না দেওয়া হয় তাহলে তাকে মহাব্রত বলা হয়॥ ৩১ ॥

সম্বন্ধ— *'যম'-এর বর্ণনা করে এখন 'নিয়ম'-এর বর্ণনা করছেন :*

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি=শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর শরণাগতি—এই পাঁচটি ; **নিয়মাঃ**=হল নিয়ম।

ব্যাখ্যা—১) জল, মৃত্তিকাদির দ্বারা শরীর, বস্ত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করা হল বাইরের শুদ্ধি। এছাড়াও বর্ণাশ্রম ও যোগ্যতা অনুসারে ন্যায়পূর্বক উপার্জিত ধন ও শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রানুকূল সাত্ত্বিক ভোজন এবং সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য সুব্যবহার করা হল বাইরের শুদ্ধির অন্তর্গত। জপ-তপ ও শুদ্ধ চিন্তা তথা মৈত্রী-করুণা প্রভৃতি সৎ ভাবনা দ্বারা অন্তঃকরণের রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি মলের নাশ করা হল ভিতরের শুদ্ধি।

২) সন্তোষ—কর্তব্য-কর্ম পালন করতে গিয়ে পরিণামে যাই হোক না কেন—তা মেনে নিতে হবে। প্রারব্ধ অনুসারে যা কিছু প্রাপ্তি হবে, যে অবস্থা, যে পরিস্থিতিতে থাকতে হবে—তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সেখানে কোনোরকম কামনা বা অসন্তোষ না থাকাই হল 'সন্তোষ'।

৩) তপ বা তপস্যা, ৪) স্বাধ্যায় এবং ৫) ঈশ্বর-প্রণিধান—এই তিনের ব্যাখ্যা ক্রিয়াযোগের বর্ণনায় বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য যোগ. ২।১) ॥ ৩২ ॥

সম্বন্ধ—*যম-নিয়ম অনুষ্ঠানে বিঘ্ন উপস্থিত হলে সেই বিঘ্ন প্রতিকারের উপায় বলছেন :*

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কবাধনে=যখন বিতর্ক (যম, নিয়মের বিরোধী দ্বেষ-হিংসার ভাব) যম-নিয়ম পালনে বাধার সৃষ্টি করে তখন ; **প্রতিপক্ষভাবনম্**=তার প্রতিপক্ষ (বিপরীত) বিষয়ের বারবার চিন্তন করা (উচিত)।

ব্যাখ্যা—যখন কোনো সঙ্গদোষের জন্য বা অন্যায়ভাবে কেউ বিরক্ত করলে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বা অন্য কোনো কারণে মন হিংসা, মিথ্যাচার, চুরি ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়ে যম-নিয়মাদি ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয় তখন মনে ওই সমস্ত হিংসাদির বিরুদ্ধে অহিংসাদির ভাব উৎপন্ন করতে হবে অর্থাৎ ওই বিকারের মধ্যে দোষ দর্শনরূপ প্রতিপক্ষের ভাবনা আনতে

হবে॥ ৩৩ ॥

সম্বন্ধ——*এই দোষদর্শনরূপ প্রতিপক্ষ ভাবনার বর্ণনা করছেন :*

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহ-পূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্॥ ৩৪ ॥

হিংসাদয়ঃ=(যম ও নিয়মের বিরোধী) হিংসা ইত্যাদি ভাবকে ; **বিতর্কাঃ**=বিতর্ক বলা হয় ; (এটি তিন প্রকারের হয়) **কৃতকারি-তানুমোদিতা**=স্বয়ংকৃত, অন্যের দ্বারা কারিত (করানো) ও অনুমোদিত ; **লোভক্রোধমোহপূর্বকাঃ**=এর কারণ হল লোভ-ক্রোধ-মোহ ; **মৃদুমধ্যাধিমাত্রাঃ**=এর মধ্যেও আছে অল্প-বেশি-মধ্যম ; **দুঃখাজ্ঞানানন্তফলাঃ**=এগুলি দুঃখ ও অজ্ঞানরূপ অনন্ত ফলদায়ক ; **ইতি**=এইভাবে (বিচার করা) ; **প্রতিপক্ষভাবনম্**=হল প্রতিপক্ষের ভাবনা।

ব্যাখ্যা—হিংসা, অসত্য, চৌর্য, ব্যাভিচার ইত্যাদি অবগুণ যা যম-নিয়মের বিরোধী তার নাম 'বিতর্ক'। স্বয়ংকৃত, অন্যের দ্বারা কারিত ও অনুমোদিত—এই ত্রিবিধ বিতর্ক কখনো লোভ, কখনো ক্রোধ, কখনো মোহ থেকে এবং কখনো অল্প, কখনো মধ্যম, কখনো ভয়ংকররূপে সাধকের সামনে উপস্থিত হয়ে সাধককে জ্বালাতন করে। সেই সময় সাধককে সাবধান হয়ে বিচার করতে হবে যে হিংসাদি দোষ অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং নরকবাসের কারণ। এর পরিণাম হল অনন্তকাল ধরে দুঃখভোগ করা এবং অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে শূকর-কুকুর প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করা। এ সব ত্যাগ করে দৃঢ়তাপূর্বক যম-নিয়মের পালন করতে হবে। এই ধরনের বিচার করতে থাকাই হল প্রতিপক্ষের ভাবনা করা॥ ৩৪ ॥

সম্বন্ধ——*এইভাবে যম-নিয়মের বিরোধী হিংসাদিকে দূর করার উপায় হিসাবে সর্বদা হিংসাদির দোষ অনুসন্ধান করতে বলে এখন যম-নিয়মের প্রতি আকৃষ্ট করবার জন্য তা পালনে ভিন্ন ভিন্ন লাভের কথা বলেছেন :*

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াম্=অহিংসাতে দৃঢ় স্থিতি হবার পর ; **তৎসন্নিধৌ**=সেই যোগীর সংসর্গে ; **বৈরত্যাগঃ**=সকল প্রাণী শত্রুতা ত্যাগ করে।

ব্যাখ্যা—যোগীর মধ্যে যখন অহিংসা ধর্ম পূর্ণরূপে দৃঢ়তা লাভ করে, স্থিরতা প্রাপ্ত হয় তখন তাঁর নিকটবর্তী হিংস্র জন্তুও বৈরিভাব ত্যাগ করে। রামায়ণ, মহাভারতে যেখানে মুনি-ঋষিদের আশ্রমের বর্ণনা আছে সেখানে বনচর প্রাণীদের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরিতার অভাব দেখানো হয়েছে। এসবই হল ঋষিগণের মধ্যে অহিংসাভাব প্রতিষ্ঠার দ্যোতক [১]॥ ৩৫ ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্॥ ৩৬ ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াম্=(যোগীর মধ্যে) সত্যের দৃঢ় স্থিতি হলে ; **ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্**=ক্রিয়া ফল অধীনস্থ হয়।

ব্যাখ্যা—যোগী যখন সত্য পালনে সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতা অর্জন করেন, তখন তাঁর অনুষ্ঠিত কার্যের ফলও তাঁর অধীন থাকে অর্থাৎ বাকসিদ্ধি হয়।

---

[১] বাল্মীকীয় রামায়ণ বনকাণ্ডে অগস্ত্যাশ্রমের বর্ণনায় আছে—

যদাপ্রভৃতি চাক্রান্তা দিগিয়ং পুণ্যকর্মণা।
তদাপ্রভৃতি নির্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ॥
অয়ং দীর্ঘায়ুষস্তস্য লোকে বিশ্রুতকর্মণঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ॥
নাত্র জীবন্মৃষাবাদী ক্রূরো বা যদি বা শঠঃ।
নৃশংসঃ পাপবৃত্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ॥

(সর্গ. ১১। ৮৩, ৮৬, ৯০)

তুলসীদাসকৃত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও আছে—

খগ মৃগ বিপুল কোলাহল করহীঁ। বিরহিত বৈর মুদিত মন চরহীঁ॥

(বাল্মীকি-আশ্রমবর্ণন)

তথা—

বয়রু বিহাই চরহিঁ এক সংগা। জহঁ তহঁ মনহুঁ সেন চতুরংগা॥

(চিত্রকূটবর্ণন)

তাৎপর্য হল কেউ হয়তো কোনো কর্ম করেনি, অথচ সেই কর্মের ফল তাকে প্রদান করার শক্তি ওই যোগীর মধ্যে এসে যায় অর্থাৎ কাউকে বরদান করলে, শাপ দিলে বা আশীর্বাদ করলে তা সত্যে পরিণত হয়॥ ৩৬ ॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্॥ ৩৭ ॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াম্=অচৌর্যবৃত্তি দৃঢ়মূল হলে (ওই যোগীর সামনে) ; **সর্বরত্নোপস্থানম্**=সমস্ত রকমের রত্ন প্রকট হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—সাধকের মধ্যে যখন অচৌর্যবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়মূল হয় তখন পৃথিবীর সমুদয় ধনরত্ন, এমনকি গুপ্তস্থানে রক্ষিত রত্নও তাঁর সামনে নিজে থেকেই প্রকট হয়। অর্থাৎ সাধকের সর্বরত্নলাভের তৃপ্তি জন্মায় ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াম্=ব্রহ্মচর্যে দৃঢ় স্থিতি হলে ; **বীর্যলাভ**=সামর্থ্য অর্জিত হয়।

ব্যাখ্যা—সাধকের যখন ব্রহ্মচর্যে দৃঢ় স্থিতি হয় তখন তার মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় ও শরীরে এক অপূর্ব শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই তার সমকক্ষ হতে পারে না॥ ৩৮ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ॥ ৩৯ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্যে=অপরিগ্রহের স্থিতি লাভ হলে ; **জন্মকথন্তাসংবোধঃ**=পূর্বজন্ম কেমন ছিল—সেকথা স্মরণে আসে।

ব্যাখ্যা—যোগীর মধ্যে যখন অপরিগ্রহ সর্বাংশে স্থিত হয় তখন তিনি পূর্বজন্ম ও বর্তমান জন্মের সমস্ত কথা জানতে পারেন অর্থাৎ পূর্বে আমি কোন যোনিতে ছিলাম, সে সময় কী কী কাজ করেছিলাম, কেমন ছিলাম—সে সমস্ত মনে পড়ে যায় এবং এ জন্মের অতীতও স্মরণে আসে। এই জ্ঞান সংসারে বৈরাগ্যে সহায়ক হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য যোগসাধনে প্রবৃত্ত করতে সহায়তা করে।

এ পর্যন্ত যমের সিদ্ধির নানা ফলের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও নিষ্কাম

ভাবনার দ্বারা যমের নিয়ম পালন করলে তা কৈবল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করে।। ৩৯ ।।

সম্বন্ধ——*এখন নিয়ম পালনের কী ফল—সেকথা বলছেন, কিন্তু এই সূত্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠার শর্ত রাখা হয়নি। এর দ্বারা বোধগম্য হয় যে সাধক যত বেশি এর পালন করবে ততবেশি সে লাভবান হবে। পরবর্তী সূত্রে প্রথমেই বাহ্য শৌচের ফলের কথা বলা হয়েছে :*

শৌচাৎস্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।। ৪০ ।।

শৌচাৎ=শৌচ পালনের দ্বারা ; **স্বাঙ্গজুগুপ্সা**=আপন শরীরের প্রতি বৈরাগ্য (এবং) ; **পরৈঃ অসংসর্গঃ**=অন্যের সঙ্গে সংসর্গ না করার ইচ্ছা (উৎপন্ন হয়)।

ব্যাখ্যা——বাহ্য শুদ্ধি পালনের দ্বারা সাধকের নিজ শরীরের প্রতি এক প্রকার জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা জন্ম নেয় ও মলমূত্রাদিময় শরীরের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে এবং দেহের প্রতি অনাসক্তি হয়। এমনকি সাংসারিক মানুষের সঙ্গ বা পরশরীর সংসর্গের ইচ্ছাও নিবৃত্ত হয়।। ৪০ ।।

সম্বন্ধ—— *আভ্যন্তর শুদ্ধির ফল বলছেন—*

সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি চ।। ৪১ ।।

চ=এছাড়া (আভ্যন্তর শৌচ অনুশীলন করলে) ; **সত্ত্বশুদ্ধিসৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি**=অন্তঃকরণ-শুদ্ধি, মনে প্রসন্নতা, চিত্তের একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা এসে যায়।

ব্যাখ্যা——আভ্যন্তর শৌচের জন্য মৈত্রী, করুণা ইত্যাদি ভাবনা এবং জপ-তপ ইত্যাদি যে কোনো সাধন দ্বারা অভ্যাস আরম্ভ করলে রাগ- দ্বেষ- হিংসা-ঈর্ষ্যা ইত্যাদি মলের নাশ হয় এবং মানুষের অন্তঃকরণ নির্মলতা ও স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। মনের চঞ্চলতা চলে যায় ও প্রসন্নতা আসে ; বিক্ষেপহীন মনে একাগ্রতা দেখা দেয় এবং ইন্দ্রিয় মনের বশীভূত হয়। এমত অবস্থায় যোগীর মধ্যে আত্ম-দর্শনের যোগ্যতা আসে।

এইভাবে পূর্বসূত্রে বাহ্য শৌচের ফল এবং এই সূত্রে আন্তর শৌচের ফলের কথা ব্যক্ত হয়েছে।। ৪১ ।।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ॥ ৪২ ॥

সন্তোষাৎ=সন্তোষের দ্বারা ; **অনুত্তমসুখলাভঃ**=যার থেকে উত্তম আর কোনো সুখ নেই—সেই সর্বোত্তম সুখের অনুভূতি হয়।

ব্যাখ্যা—সন্তোষ-ধন প্রাপ্ত হলে কামনারহিত যোগী পরম সুখ লাভ করেন। কোনো সাংসারিক সুখের সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। তা হল সর্বোত্তম সুখ॥ ৪২ ॥

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ॥ ৪৩ ॥

তপসঃ=তপের প্রভাবে ; **অশুদ্ধিক্ষয়াৎ**=যখন অশুদ্ধি নাশ হয়, তখন ; **কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ**=শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা—সাধনের নিমিত্ত ব্রত-উপবাস পালন করা বা তপোনিষ্ঠ হয়ে নানারকম কৃচ্ছ্রসাধন করার নাম 'তপ' (যোগ. ২।১-র টীকা)। তপস্যারত যোগীর শরীর ও ইন্দ্রিয়ের মল নাশ হয়। সেই তপঃসিদ্ধ যোগীর শরীর স্বস্থ, স্বচ্ছ ও লঘু হয়ে যায় অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কে যোগী তাঁর ইচ্ছামতো পরিচালনা করতে পারেন। তৃতীয় পাদের ৪৫ নং এবং ৪৬ নং সূত্রে উল্লিখিত কায়সম্পদরূপ শরীরসম্বন্ধী সিদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ যোগী তখন ইচ্ছামাত্র সূক্ষ্মশরীরে দূরদেশে গমন করতে পারেন, চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকা সূক্ষ্মতম বস্তুকে দেখতে পান বা ব্যবধানযুক্ত স্থানে স্থিত বিষয় দেখতে পান বা শুনতে পান। এইভাবে যোগীর মধ্যে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধী সিদ্ধির প্রাপ্তি ঘটে॥ ৪৩ ॥

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায়াৎ=স্বাধ্যায়ের দ্বারা ; **ইষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ**=ইষ্টদেবের দর্শন (সাক্ষাৎকার) হয়।

ব্যাখ্যা—শাস্ত্রের অধ্যয়ন, ইষ্টমন্ত্র জপ, নিজ জীবনের অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়ের প্রভাবে যখন উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্তি হয় তখন সেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ যোগীর ইষ্টদেবতার দর্শন হয়॥ ৪৪ ॥

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ=ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা ; **সমাধিসিদ্ধিঃ**=সমাধিতে সিদ্ধিলাভ হয়।

ব্যাখ্যা—ঈশ্বরের শরণাগত হলে যোগসাধনার পথে আগত সমস্ত বিঘ্নের সর্বথা নাশ হয়ে শীঘ্র সমাধি সাধিত হয় (যোগ. ১।২৩)। ঈশ্বর-নির্ভর সাধক কেবল তৎপর হয়ে সাধনে ব্যস্ত থাকেন, সাধনের পরিণামের চিন্তাও তাঁর থাকে না। তাঁর সাধনে আগত বিঘ্ন দূর করা এবং সাধনে সিদ্ধির দায়িত্ব ঈশ্বরের উপর বর্তায়। অতএব ঈশ্বরপ্রণিধাতা সাধকের সাধন যে অনায়াসে হবে, শীঘ্রই যে সফল হবে—তা স্বাভাবিক॥ ৪৫ ॥

সম্বন্ধ—*এ পর্যন্ত যম ও নিয়মের ফলসহ বর্ণনা করা হল। এবার 'আসন'-এর লক্ষণ, উপায় ও তার ফল ক্রমান্বয়ে জানানো হচ্ছে :*

স্থিরসুখমাসনম্॥ ৪৬ ॥

স্থিরসুখম্=নিশ্চলভাবে (চাঞ্চল্যহীন) সুখপূর্বক বসা হল ; **আসনম্**=আসন।

ব্যাখ্যা—হঠযোগে আসনের অনেক উপায় বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে সূত্রকার তার বর্ণনা করেননি, বরং উপবেশনের ভঙ্গিটি সাধকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যে আসনে সাধক আপন যোগ্যতা অনুসারে শরীরের নড়াচড়া ছাড়া, শারীরিক কষ্ট ছাড়া স্থিরভাবে সুখপূর্বক দীর্ঘসময় পর্যন্ত বসে থাকতে পারে, সেই আসনই তার পক্ষে উপযুক্ত। এছাড়া যার উপর উপবেশন করে সাধক সাধনা করেন তার নামও 'আসন'। উপবেশনের আসনটিও স্থির ও সুখদায়কভাবে বসার যোগ্য হতে হবে॥ ৪৬ ॥[১]

---

[১]গীতায় যোগাভ্যাসের আসনকে স্থির ও অচলভাবে স্থাপন করতে বলা হয়েছে। সেখানে বসার নিয়ম হিসাবে বলা হয়েছে—শরীর, গ্রীবা ও মস্তক সোজা এবং স্থির থাকবে। এখানেও কোনো বিশেষ আসনের নাম দেওয়া হয়নি (দ্রষ্টব্য গীতা অধ্যায় ৬, ১১-১৩)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ২।৮-এ বলা হয়েছে বক্ষঃস্থল-গ্রীবা-মস্তক-শরীরের এই তিনটি অংশ সমুন্নত করে, শরীরকে সমভাবে স্থাপন করে, ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের সাহায্যে হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্॥ ৪৭ ॥

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্=(উক্ত আসন) প্রযত্নে শিথিলতা এনে এবং অনন্তে (পরমাত্মা) চিত্ত নিবিষ্ট করলে (সিদ্ধ হয়)।

ব্যাখ্যা—শরীরকে সোজা এবং স্থির করে সুখাসনে বসার পর শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত রকমের চেষ্টা ত্যাগ করে দেওয়াই হল প্রযত্নের শিথিলতা এবং সেইসঙ্গে চিত্তকে অনন্তের ভাবনায় নিমগ্ন রাখা। এই দুটি উপায়ে আসনের সিদ্ধি হয়।

অনেক টীকাকার অনন্তের অর্থ শেষনাগ ও সমাপত্তির অর্থ সমাধি করেছেন। শ্রীভোজরাজ অনন্তের অর্থ আকাশ এবং সমাপত্তির অর্থ চিত্তের তদ্রূপ হয়ে যাওয়া বলেছেন। কিন্তু যোগের অঙ্গ-সমূহের মধ্যে সমাধিকে অন্তিম অঙ্গ বলা হয়েছে। তার জন্যই আসন আদি অঙ্গের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। সেজন্য কোনোরকম সমাধিকেই আসনে স্থিরতার উপায় বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। সজ্জন, বিদ্বান, অনুভবী, মহানুভবী ব্যক্তিগণ এর উপর বিচার করবেন ॥ ৪৭ ॥

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ॥ ৪৮ ॥

ততঃ=এর (আসনে সিদ্ধি) দ্বারা ; **দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ**=(শীত-উষ্ণ ইত্যাদি) দ্বন্দ্বের আঘাত লাগে না।

ব্যাখ্যা—আসন-সিদ্ধি হয়ে গেলে শরীরে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ে না। শরীরের যাবতীয় পীড়া সহ্য করার শক্তি এসে যায়। সেজন্য ওই দ্বন্দ্ব চিত্তকে চঞ্চল করতে পারে না বা সাধকের সাধনে বিঘ্ন আনতে পারে না॥ ৪৮ ॥

প্রণবরূপ ভেলাদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি ভয়াবহ সংসার-স্রোত অতিক্রম করবেন। শ্বেতা. উ. ২।১০-এও বলা হয়েছে যে, যে স্থান সমতল ও পবিত্র, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি বা বালুকা নেই, যে স্থান মধুর শব্দ, জল ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম এবং চক্ষু-স্নিগ্ধকর—এইরূপ বায়ুবেগশূন্য গুহা প্রভৃতি স্থানে উপবিষ্ট হয়ে মনকে পরমাত্মায় সমাহিত করবে।

সম্বন্ধ——*এখন প্রাণায়ামের সাধারণ লক্ষণ বলা হচ্ছে :*

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

তস্মিন্ সতি=ওই আসন সিদ্ধির পর ; **শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ**=শ্বাস ও প্রশ্বাসের ; **গতিবিচ্ছেদঃ**=গতি নিরুদ্ধ হওয়া ; **প্রাণায়ামঃ**=হল প্রাণায়াম।

ব্যাখ্যা——প্রাণবায়ুর শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া হল 'শ্বাস' এবং বাইরে নির্গত হওয়া হল 'প্রশ্বাস'। এই দুই-এর গতি রুদ্ধ হওয়া অর্থাৎ প্রাণবায়ুর গমনাগমন ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়া হল প্রাণায়ামের সাধারণ লক্ষণ।

এখানে আসন সিদ্ধির পর প্রাণায়াম সম্পন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে প্রতীত হয় যে আসনে স্থিরতার অভ্যাস না করে যারা প্রাণায়াম করে তারা ভুলপথে চালিত হয়। প্রাণায়ামের অভ্যাস করার সময় আসনের স্থিরতা একান্ত আবশ্যক॥ ৪৯ ॥

সম্বন্ধ——*উক্ত প্রাণায়ামের ভেদকে বোঝাবার জন্য তিন প্রকারের প্রাণায়ামের বর্ণনা করেছেন :*

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ=(উক্ত প্রাণায়াম) তিন প্রকারের—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি ; (এবং সেটি) **দেশকালসংখ্যাভিঃ**=দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্বারা ; **পরিদৃষ্টঃ**=ভালোভাবে পরিলক্ষিত ; **দীর্ঘসূক্ষ্মঃ**=(এবং ক্রমে) দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে হতে থাকে।

ব্যাখ্যা——এই সূত্রে তিন প্রকারের প্রাণায়ামের বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিন প্রকারের প্রাণায়ামকে সাধক দেশ, কাল ও সংখ্যাদ্বারা লক্ষ্য করতে থাকেন। এর দ্বারা সাধক বুঝতে পারেন যে তিনি কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছেন। এইভাবে পরীক্ষা করতে করতে যতই উন্নতি হতে থাকে ততই প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা বাড়তে থাকে। এর দ্বারা সিদ্ধ হয় যে স্তম্ভবৃত্তিরূপ তৃতীয় প্রাণায়ামেও দেশের সম্বন্ধ থাকে। অন্যথা তা দেশ, কাল

ও সংখ্যাদ্বারা পরিদৃষ্ট হবে কীভাবে ? প্রাণায়ামের তিনটি ভেদ হল—

১) বাহ্যবৃত্তি—প্রাণবায়ুকে শরীর থেকে বাইরে বার করে দিয়ে অর্থাৎ শ্বাস পরিত্যাগ করে যতক্ষণ সম্ভব সুখপূর্বক রোধ করে রাখা যায়, রোধ করে রাখতে হবে। সাথে সাথে পরীক্ষা করতে হবে যে বাইরে গিয়ে তা কোথায় কতক্ষণ স্থির হয়ে আছে আর সেই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক প্রাণের গতির সংখ্যা কত ছিল ? এ হল 'বাহ্যবৃত্তি' প্রাণায়াম যার অন্য নাম 'রেচক'। কারণ এখানে রেচনপূর্বক প্রাণকে রোধ করে রাখা হয়। অভ্যাসের দ্বারা শ্বাসকে দীর্ঘক্ষণ রোধ করা যায় এবং 'সূক্ষ্ম' অর্থাৎ হাল্কা বা অনায়াস সাধ্যও করা যায়।

২) আভ্যন্তরবৃত্তি—বাহ্য বায়ুকে ভিতরে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে যতক্ষণ সম্ভব সুখপূর্বক রোধ করে রাখা যায়, রোধ করে রাখতে হবে। সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আভ্যন্তর দেশে কোথায় গিয়ে প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে কতক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্যে স্থির হয়ে থাকছে এবং সেই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক প্রাণের গতির সংখ্যা কত ছিল ? এ হল 'আভ্যন্তর' প্রাণায়াম যার অন্য নাম 'পূরক'। এখানে প্রাণবায়ুকে শরীরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে নিরুদ্ধ করা হয়। অভ্যাসের দ্বারা 'পূরক' প্রাণায়ামও দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়।

৩) স্তম্ভবৃত্তি—স্বাভাবিকভাবে যে প্রাণবায়ু শরীরের ভিতরে ও বাইরে যাওয়া-আসা করে, তাকে প্রযত্নপূর্বক বাইরে নিয়ে আসা বা ভিতরে নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস না করে অর্থাৎ যে প্রাণবায়ু স্বাভাবিকভাবেই বাইরে আসছে বা ভিতরে যাচ্ছে অর্থাৎ রেচক-পূরক কিছুই না করে বায়ু যেখানে আছে সেখানেই তার গতিকে রুদ্ধ করে দেওয়া এবং লক্ষ্য করতে থাকা যে প্রাণ কোন দেশে রুদ্ধ হয়ে আছে, কতক্ষণ সুখপূর্বক রুদ্ধ হয়ে আছে এবং এই সময়ে প্রাণের স্বাভাবিক গতির সংখ্যা কত হয়—এ হল 'স্তম্ভবৃত্তি' প্রাণায়াম—যার অন্য নাম 'কুম্ভক'। অভ্যাসের প্রভাবে এটিও দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হতে পারে। কোনো কোনো টীকাকার একে কেবল 'কুম্ভক' বলেন এবং

অনেকে (পরবর্তী সূত্রে কথিত) চতুর্থ প্রাণায়ামকে কেবল কুম্ভক বলেন। এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে।

সাধক যে কোনো প্রাণায়ামের অভ্যাস করুন না কেন তার সঙ্গে মন্ত্র আবশ্যক॥ ৫০ ॥

সম্বন্ধ——*চতুর্থ প্রাণায়ামের বর্ণনা করছেন :*

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ॥ ৫১ ॥

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী=বাহ্য ও অভ্যন্তরের বিষয়ের ত্যাগের ফলে যা সহজভাবে স্বতঃ সম্পাদিত হয়, তাই ; **চতুর্থঃ**=হল চতুর্থ প্রাণায়াম।

ব্যাখ্যা——বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়সমূহের চিন্তা ত্যাগ করলে অর্থাৎ প্রাণ বাইরে আসছে, না ভিতরে যাচ্ছে অথবা চলছে, না থেমে আছে——প্রাণের এই গতিবিধির দিকে লক্ষ্য না রেখে মনকে ইষ্ট চিন্তনে নিবিষ্ট রাখলে দেশ, কাল ও সংখ্যার জ্ঞান ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে প্রাণের গতি যে কোনো দেশে যে থেমে থাকে তা হল চতুর্থ প্রাণায়াম। আগের ত্রিবিধ প্রাণায়াম থেকে এই চতুর্থ প্রাণায়াম সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি বোঝাবার জন্য সূত্রে 'চতুর্থ' পদের প্রয়োগ করা হয়েছে।

এটি অনায়াসসাধ্য রাজযোগের প্রাণায়াম। এতে মনের চঞ্চলতা শান্ত হওয়ার ফলে প্রাণের গতি স্বাভাবিকভাবেই রুদ্ধ হয়। পূর্বোক্ত প্রাণায়াম-গুলিতে প্রযত্ন দ্বারা প্রাণের গতিকে ক্রমাগত রুদ্ধ করার অভ্যাস করার ফলে প্রাণের গতির নিরোধ হয়——উভয়ের মধ্যে এই হল পার্থক্য॥ ৫১ ॥

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্॥ ৫২ ॥

ততঃ=এর (প্রাণায়ামের অভ্যাস) দ্বারা ; **প্রকাশাবরণম্**=প্রকাশ (জ্ঞান)-এর আবরণ ; **ক্ষীয়তে**=ক্ষীণ হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা——মানুষ যেমন যেমন প্রাণায়ামের অভ্যাস করতে থাকে অর্থাৎ যার প্রাণায়াম যত সহজে সম্পন্ন হতে থাকে ততই তার সঞ্চিত কর্ম-সংস্কার, অবিদ্যাদি ক্লেশ ক্ষয় হতে থাকে। এই সমস্ত কর্ম, সংস্কার, অবিদ্যা ইত্যাদি ক্লেশই হল জ্ঞানের আবরণ (পর্দা)। এই আবরণ মানুষের জ্ঞানকে

আবৃত করে রাখে, তাকে মোহিত করে দেয়। অজ্ঞানের পর্দা যখন ধীরে ধীরে সরে যায় তখন সাধকের জ্ঞান-সূর্য উদিত হয় (গীতা ৫।১৬)। এইজন্য সাধকদের প্রাণায়ামের অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত ॥ ৫২ ॥

সম্বন্ধ—*প্রাণায়ামের অপর ফল নির্দেশ করছেন :*

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

চ=তথা ; **ধারণাসু**=ধারণাতে ; **মনসঃ**=মনের ; **যোগ্যতা**= যোগ্যতা (প্রাপ্তি হয়)।

ব্যাখ্যা—প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা মনের ধারণাতেও যোগ্যতা জন্মায় অর্থাৎ তাকে অনায়াসে যে কোনো স্থানে স্থির করা সম্ভব হয়॥ ৫৩ ॥

সম্বন্ধ—*এবারে প্রত্যাহারের লক্ষণ জানাচ্ছেন :*

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে=ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজেদের বিষয়ের সম্বন্ধ হতে রহিত করলে ; **ইন্দ্রিয়াণাম্**=সেই ইন্দ্রিয়গুলির ; **চিত্তস্বরূপানুকারঃ ইব**=যেন চিত্তের স্বরূপে তদাকার হয়ে যাওয়া ; **প্রত্যাহারঃ**=হল প্রত্যাহার।

ব্যাখ্যা—প্রাণায়ামের অভ্যাসের দ্বারা মন-ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়। এরপর ইন্দ্রিয়ের বাহ্যবৃত্তিকে চতুর্দিক থেকে সরিয়ে মনে বিলীন করার নাম 'প্রত্যাহার'। যেমন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যখন রূপের প্রতি আসক্ত হয়, তখনই তাকে রূপ থেকে উঠিয়ে এনে মনের কাছে অর্পণ করতে হয়। সাধনকালে সাধক যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলো ত্যাগ করে চিত্তকে আপন ধ্যেয়র প্রতি নিবিষ্ট করেন, তখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি (অর্থাৎ কর্ণের শব্দের প্রতি, নাসিকার গন্ধের প্রতি) ধাবিত না হয়ে চিত্তে বিলীন হওয়া হল প্রত্যাহার সিদ্ধ হওয়ার লক্ষণ। যদি তখনও ইন্দ্রিয় বাহ্য বিষয়ের প্রতি আগের মতই ধাবিত হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে 'প্রত্যাহার' সিদ্ধ হয়নি। উপনিষদেও 'বাক্' শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে

নিরুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে[১]॥ ৫৪ ॥

সম্বন্ধ——*এখন প্রত্যাহারের ফল বলে এই দ্বিতীয় পাদের সমাপ্তি করছেন :*

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্॥ ৫৫ ॥

ততঃ=এর (প্রত্যাহার) দ্বারা ; **ইন্দ্রিয়াণাম্**=ইন্দ্রিয়সমূহের ; **পরমা**= পরম ; **বশ্যতা**=বশ্যতা (সিদ্ধ হয়)।

ব্যাখ্যা——প্রত্যাহার সিদ্ধ হলে যোগীর ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলো তাদের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলে। প্রত্যাহার সিদ্ধ হওয়ার পর যোগীর ইন্দ্রিয় জয় করার জন্য অন্য কোনো সাধনার প্রয়োজন হয় না॥ ৫৫ ॥



---

[১]যচ্ছেদ্বাঙমনসী প্রাজ্ঞঃ। (কঠ. ১।৩।১৩)

'বিবেকী পুরুষ বাক্ আদি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বাহ্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে মনে অর্পণ করবেন অর্থাৎ এদের (ইন্দ্রিয়ের) স্থিতি এমন হবে যাতে তারা আর ক্রিয়াশীল হতে না পারে——মনে বিষয়ের স্ফুরণ না উঠে।

॥ ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ॥

বিভূতিপাদ—৩

সম্বন্ধ—দ্বিতীয় পাদে অঙ্গসহ যোগের বর্ণনায় যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার—এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধনার ফলসহ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এবার এই পাদে তিন অন্তরঙ্গ সাধনা—ধারণা, ধ্যান ও সমাধির বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ এই তিনটি যখন কোনো এক ধ্যেয়তে সম্পূর্ণতা লাভ করে তখন তার নাম হয় 'সংযম'। যোগ-বিভূতি লাভ করার জন্য সংযম প্রয়োজন। সেইজন্য অন্তরঙ্গ-সাধনের বর্ণনা সাধনপাদে না করে বিভূতিপাদে করেছেন। প্রথমেই ধারণার স্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন :

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥ ১ ॥

চিত্তস্য দেশবন্ধঃ=(শরীরের ভিতরে বা বাইরে) কোনো এক দেশে চিত্তকে স্থির করা ; **ধারণা**=হল ধারণা।

ব্যাখ্যা—নাভিচক্র, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি হল শরীরের আভ্যন্তর দেশ। চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি দেবতাগণ, আকাশ অথবা যে কোনো মূর্তি বা যে কোনো পদার্থ হল বাইরের দেশ। এগুলির মধ্যে যে কোনো একটি দেশে চিত্তবৃত্তিকে স্থির করা হল 'ধারণা'॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*ধ্যানের স্বরূপ বলছেন—*

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥ ২ ॥

তত্র=(যেখানে চিত্তকে নিবিষ্ট করা হয়) সেখানে ; **প্রত্যয়ৈকতানতা**=

বৃত্তির প্রবাহ একভাবে থাকা ; **ধ্যানম্**=হল ধ্যান।

ব্যাখ্যা—যে ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তকে নিবিষ্ট করা হয়েছে, তাতে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ কেবলমাত্র ধ্যেয়র প্রতি বৃত্তির নিরন্তর প্রবাহ একইভাবে বয়ে চলা—মাঝখানে অন্য কোনো বৃত্তির আবির্ভাব না ঘটাই হল ধ্যান॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*সমাধির স্বরূপ বলছেন :*

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

অর্থমাত্রনির্ভাসম্=যখন (ধ্যানে) কেবল ধ্যেয়মাত্রের প্রতীতি হয় এবং ; **স্বরূপশূন্যমিব**=চিত্তের নিজ স্বরূপ যেন শূন্যতা প্রাপ্ত হয় ; **তদেব**=সেই (ধ্যানই) ; **সমাধিঃ**=সমাধি আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—গভীর ধ্যানে মগ্ন হলে চিত্ত যখন ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়ে যায়, আপন স্বরূপের যেন অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকে না (অর্থাৎ আমি ধ্যান করছি এই বোধ থাকে না, ধ্যেয়তেই চিত্ত একাকার হয়ে যায় তখন তা 'সমাধি' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই লক্ষণ নির্বিতর্ক সমাপত্তি নামে প্রথম পাদে উল্লেখ করা হয়েছে (যোগ. ১।৪৩)॥ ৩ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত তিন সাধনের সাঙ্কেতিক নাম জানানো হচ্ছে :*

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

একত্র=কোনো এক ধ্যেয়-বিষয়ে ; **ত্রয়ম্**=তিনের উপস্থিতি ; **সংযম**=হল সংযম।

ব্যাখ্যা—ধারণা-ধ্যান-সমাধি—এ তিনটি কোনো এক ধ্যেয়র প্রতি প্রয়োগ করার নাম 'সংযম'। সেইজন্য এই গ্রন্থের যেখানে যেখানে 'সংযম' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ সংযম পালনের কথা বা সংযমের ফলের কথা বলা হয়েছে সেখানেই বুঝে নিতে হবে যে ধারণা-ধ্যান-সমাধি—এই তিনটিকেই একই ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করার কথা বলা হয়েছে ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধ—*সংযমের সিদ্ধির ফল বলছেন :*

তজ্জয়াৎপ্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

তজ্জয়াৎ= তাকে জয় করলে (অর্থাৎ সংযম সিদ্ধ হলে) ; **প্রজ্ঞালোকঃ**= বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে।

ব্যাখ্যা—সাধনার নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা যখন যোগী সংযমে বিজয় লাভ করে অর্থাৎ চিত্তে এমন যোগ্যতার আবির্ভাব হয় যার দ্বারা সে যে বিষয়ে সংযমী হতে চায় তৎক্ষণাৎ তা সিদ্ধ করতে পারে সেই সময় যোগীর বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে অর্থাৎ তার বুদ্ধি অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন হয়। প্রথম পাদে একেই অধ্যাত্মপ্রসাদ ও ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়েছে (যোগ. ১।৪৭-৪৮)॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ—*সংযমের প্রয়োগ বিধির বর্ণনা করছেন*—

তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

তস্য= সেই সংযমের, (ক্রমানুসারে) ; **ভূমিষু**=ভূমি বা স্তরসমূহে ; **বিনিয়োগঃ**= বিনিয়োগ (করা উচিত)।

ব্যাখ্যা—সংযমের প্রয়োগ ক্রমে ক্রমে করতে হবে। প্রথমে স্থূল বিষয়ে সংযম করা শিখতে হবে। সেগুলো আয়ত্ত হবার পর সূক্ষ্ম বিষয়ে ক্রমান্বয়ে সংযম করা শিখতে হবে। এইভাবে যেসব বিষয়ে সংযম স্থিত হয়ে যায় সেখান থেকে আরও এগিয়ে যেতে হবে॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত তিন সাধনের বিশেষত্ব বর্ণনা করছেন :*

ত্রয়মন্তরঙ্গম্ পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

পূর্বেভ্যঃ=পূর্বে কথিত যোগাঙ্গগুলির তুলনায় ; **ত্রয়ম্**=এই তিনটি (সাধন) ; **অন্তরঙ্গম্**=হল অন্তরঙ্গ।

ব্যাখ্যা—পূর্বের দ্বিতীয় পাদে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার—এই পাঁচটিকে যোগের বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়েছে। এখানে ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই তিনটিকে যোগের অন্তরঙ্গ সাধন বলা হয়েছে। কারণ যোগে সিদ্ধিলাভে এই তিনের নিকটতম সম্বন্ধ রয়েছে॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ—*নির্বীজ সমাধির বিশেষতা জানাচ্ছেন—*

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য॥ ৮ ॥

তদপি=ওইগুলো (উপরিউক্ত ধারণা-ধ্যান-সমাধি)ও ; **নির্বীজস্য**=(হল) নির্বীজ সমাধির ; **বহিরঙ্গম্**=বহিরঙ্গ (সাধন)।

ব্যাখ্যা—পর-বৈরাগ্য দৃঢ় হলে যখন সমাধিপ্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধ হয়ে যায় তখন নির্বীজ সমাধি সিদ্ধ হয় (যোগ. ১।৫১)। অতএব ধারণা-ধ্যান-সমাধিও তার অন্তরঙ্গ সাধন হতে পারে না, কারণ সেক্ষেত্রে সর্ববৃত্তির নিরোধ করা হয়ে থাকে (যোগ. ১।১৮) ; কোনো এক ধ্যেয়তে চিত্তকে স্থির করার জন্য অভ্যাস করা হয় না॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*গুণসমূহের স্বভাব চঞ্চলতা, প্রতিক্ষণই তাদের পরিণাম হতে থাকে। চিত্ত হল গুণের কার্য। সেজন্য সেও (চিত্ত) কখনো এক অবস্থায় থাকে না। অতএব নিরোধসমাধি কালে তার কীরকম পরিণাম হয়, তা বলছেন—*

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণ-চিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ=ব্যুত্থান অবস্থার সংস্কারের অভিভূত হওয়া বা দমে যাওয়া এবং নিরোধ অবস্থার সংস্কারের প্রাদুর্ভাব হওয়া ; **নিরোধক্ষণ-চিত্তান্বয়ঃ**=নিরোধকালে চিত্তের নিরোধ-সংস্কারানুগত হওয়া ; **নিরোধপরিণামঃ**=হল নিরোধ পরিণাম।

ব্যাখ্যা—নিরোধসমাধিতে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নাশ হলেও তার সংস্কারের নাশ হয় না। সেই সময় কেবল সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে, এটি প্রথম পাদে বলা হয়েছে (যোগ. ১।১৮)। সেইজন্য নিরোধকালে চিত্ত ব্যুত্থান ও নিরোধ—উভয় প্রকারের সংস্কারের মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকে। কারণ চিত্ত হল ধর্মী (আধার) আর যে কোনো সংস্কার হল তার ধর্ম—ধর্মী আপন ধর্মে সর্বদাই ব্যাপ্ত থাকবে—এটাই নিয়ম (যোগ. ৩।১৪)। এই যে নিরোধকালে ব্যুত্থান-সংস্কারের অভিভব এবং নিরোধ সংস্কারের প্রাদুর্ভাব

তথা চিত্তের নিরোধ-সংস্কারের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটা—এই হল ব্যুত্থান ধর্ম হতে নিরোধ ধর্মে পরিণত হওয়া-রূপ নিরোধ পরিণাম।[১] নিরোধ-সমাধির তুলনায় সম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেও ব্যুত্থান অবস্থা বলে গণ্য করা হয় (যোগ. ৩।৮)। সেইজন্য তার সংস্কারগুলিকেও এখানে ব্যুত্থান সংস্কারের অন্তর্গত বলে মনে করতে হবে ॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ—*এর পর কী হয়, তা বলছেন :*

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ॥ ১০ ॥

সংস্কারাৎ=সংস্কার শক্তির দ্বারা ; **তস্য**=সেই (চিত্তের) ; **প্রশান্তবাহিতা**=প্রশান্তবাহিতা (স্থৈর্য -প্রবাহ বা স্থিতি) জন্ম নেয়।

ব্যাখ্যা—পূর্বের সূত্রানুযায়ী যখন ব্যুত্থান-সংস্কার সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়ে যায় এবং নিরোধ-সংস্কার বর্ধিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন কেবল ওই শুধুমাত্র সংস্কারমাত্রশেষচিত্তে নিরোধ সংস্কারের আধিক্যবশতঃ নির্মল নিরোধ-সংস্কারের প্রবাহ বইতে থাকে। এই হল নিরুদ্ধ চিত্তের অবস্থা-পরিণাম ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ—*এখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের যে পরিণাম হয় তা বলছেন :*

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ=সর্ববিষয়ে চিন্তা করার প্রবৃত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত

---

[১]এখানে সমাধি-পরিণাম এবং একাগ্রতা-পরিণামের লক্ষণ প্রথমে না করে প্রথমে নিরোধ-পরিণামের স্বরূপ বলছেন। এর কারণ রূপে বলা যায় যে ৮নং সূত্রে নিরোধ-সমাধির বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্য প্রথমে নিরোধ-পরিণামের লক্ষণ জানানো আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কেননা প্রথমে (যোগ. ১।৫১) নিরোধ-সমাধির লক্ষণে সর্ববৃত্তির নিরোধের দ্বারা নির্বীজ সমাধি সিদ্ধির কথা বলেছেন। কাজেই সেখানে পরিণাম না হওয়ার ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যতক্ষণ চিত্তের গুণ হতে ভিন্ন সত্তা থাকে, তা আপন কারণে বিলীন হয় না, ততক্ষণ তাতে পরিণামী অবস্থা অনিবার্য। অতএব নিরোধ-পরিণাম কী রকমের হয় স্বাভাবিকভাবে তা জানার ইচ্ছা জাগতে পারে।

হওয়া এবং কোনো এক বিশেষ ধ্যেয়কে চিন্তা করার একাগ্রতা-অবস্থার উদয় হওয়া হল ; **চিত্তস্য**=চিত্তের ; **সমাধি-পরিণামঃ**=সমাধি-পরিণাম।

ব্যাখ্যা—নিরোধ-সমাধির পূর্বে যখন যোগীর সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়ে যায়, সেই সময় চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে একাগ্র-অবস্থার উদয় হয়। নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কেবল ধ্যেয়মাত্রের জ্ঞান থাকে, চিত্তের নিজ স্বরূপের পর্যন্ত ভান থাকে না (যোগ. ১।৪৩)। চিত্তের এই বিক্ষিপ্তাবস্থা থেকে একাগ্র-অবস্থায় পরিণত হয়ে যাওয়াই হল সমাধি-পরিণাম ॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ—*তার পরের স্থিতির বর্ণনা করছেন :*

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা-পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ=তারপর ; **পুনঃ**=পুনরায় ; **শান্তোদিতৌ**=শান্তির স্থিতি ও উদয়ের স্থিতি ; **তুল্যপ্রত্যয়ৌ**=দুটি বৃত্তিই যেন একাকার হয়ে যায়, তখন তা ; **চিত্তস্য**= চিত্তের ; **একাগ্রতা-পরিণাম**=একাগ্রতা-পরিণাম।

ব্যাখ্যা—চিত্তের বিক্ষিপ্ত-অবস্থা থেকে একাগ্র-অবস্থায় প্রবেশ করার সময় তার (চিত্তের) যে পরিণাম হয়, তার নাম সমাধি-পরিণাম। চিত্ত সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হয়ে গেলে চিত্তের যে পরিণাম হয় তাকে একাগ্রতা-পরিণাম বলে। সেখানে শান্ত হওয়া বা উদয় হওয়ার বৃত্তি এক হয়ে যায় (অর্থাৎ কোনো এক ধ্যেয়বস্তু অবলম্বন করলে প্রথমে যে বৃত্তি জন্ম নেয় তা শান্ত হতে না হতে যদি পুনরায় তদাকার বৃত্তি উদিত হয়, তখন তা হবে একাগ্রতা-পরিণাম)।

পূর্বোক্ত সমাধি-পরিণামে শান্তি ও উদয়কারী বৃত্তি দুটির মধ্যে ভেদ থাকে। কিন্তু একাগ্রতা-পরিণামে এই ভেদ থাকে না। এটাই হল সমাধি-পরিণাম ও একাগ্রতা-পরিণামের মধ্যে পার্থক্য। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রথম অবস্থায় সমাধি-পরিণাম হয় আর তার পরিপক্ক অবস্থায় একাগ্রতা-পরিণাম হয়। এই একাগ্রতা-পরিণামের সময় বিরাজমান স্থিতিকেই পূর্বের পাদে

নির্বিচার সমাধির নির্মলতা বা প্রশান্ততা নামে অভিহিত করা হয়েছে (যোগ. ১।৪৭)॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ—*উপরিউক্ত পরিণামের নাম বলতে গিয়ে সেই উদাহরণের সাহায্যে অন্য সমস্ত সংঘটিত পরিণামের ব্যাখ্যা করছেন :*

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

এতেন=(উপরে যে চিত্তের পরিণামের কথা বলা হয়েছে) তার দ্বারা ; **ভূতেন্দ্রিয়েষু**=পাঁচ ভূত ও সর্ব ইন্দ্রিয়ে সংঘটিত ; **ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামাঃ**=ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম (এই তিনটি পরিণাম) ; **ব্যাখ্যাতাঃ**=ব্যাখ্যাত হল।

ব্যাখ্যা—পূর্বের ৯নং ও ১০নং সূত্রে নিরোধ-সমাধির সময় চিত্তের ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণামের বর্ণনা করা হয়েছে এবং ১১নং ও ১২নং সূত্রে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির সময় চিত্তের ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণামেরও বর্ণনা করা হয়েছে। সংসারের সমস্ত বস্তুতে এই পরিণাম অবিশ্রান্ত চলতে থাকে। কারণ গুণত্রয় পরিণামশীল সুতরাং তাদের কার্যস্বরূপ জগৎসংসারে পরিবর্তন চলতে থাকা অনিবার্য। এইজন্য এই সূত্রে বলা হচ্ছে যে, পূর্ববর্ণিত প্রকারে পঞ্চভূত ও সর্ব ইন্দ্রিয়ে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম হয়ে থাকে বলে বুঝে নিতে হবে। উদাহরণসহ এদের পার্থক্য বোঝানো হল :

একথা মনে রাখতে হবে যে সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অস্তিত্ব-হীন কোনো পদার্থ কখনো উৎপন্ন হয় না। যে কোনো বস্তু উৎপন্ন হোক না কেন, উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তা আপন কারণে বিদ্যমান ছিল এবং লুপ্ত হওয়ার পরও বিদ্যমান থাকবে (যোগ. ৪।১২)।

(১) ধর্ম-পরিণাম—যখন কোনো ধর্মীর মধ্যে এক ধর্মের লয় হয়ে অন্য ধর্মের উদয় হয় তখন তাকে ধর্ম-পরিণাম বলে। যেমন, ৯নং সূত্রে চিত্তরূপ ধর্মীতে ব্যুত্থান-সংস্কাররূপ ধর্মের শক্তিহীন হয়ে নিরোধ-সংস্কাররূপ ধর্মের উত্থান হওয়ার কথা বলা হয়েছে—এ হল ধর্মসমূহে বিদ্যমান থাকা চিত্তরূপ

ধর্মীর ধর্ম-পরিণাম। একইভাবে ১১নং সূত্রে সর্বার্থতারূপ ধর্মের ক্ষয় ও একাগ্রতারূপ ধর্মীর উদয়ের কথা বলা হয়েছে—এও চিত্তরূপ ধর্মীর ধর্ম-পরিণাম। মৃত্তিকায় পিণ্ডরূপ ধর্মের ক্ষয় এবং ঘটরূপ ধর্মের উদয়, পুনরায় ঘটরূপ ধর্মের ক্ষয় এবং তার কপালরূপ (ভগ্ন মৃত্তিকাপাত্র) ধর্মের উদয় হল এই সমস্ত ধর্মে বিদ্যমান থাকা মৃত্তিকারূপ ধর্মীর ধর্ম-পরিণাম। অন্যান্য সমস্ত বস্তুতেও যে এই একই প্রক্রিয়া বর্তমান তা বুঝে নিতে হবে।

(২) লক্ষণ-পরিণাম—এই পরিণামও ধর্ম-পরিণামের সাথে সাথেই থাকে। ধর্মে এই লক্ষণ-পরিণাম হয় (যোগ. ৪।১২)। বর্তমান ধর্মের লুপ্ত হওয়া হল তার অতীত লক্ষণ-পরিণাম এবং অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ধর্মের প্রকট হওয়া হল বর্তমান লক্ষণ-পরিণাম এবং প্রকট হওয়ার পূর্বে তা অনাগত লক্ষণযুক্ত থাকে। এই তিনটিকে ধর্মের লক্ষণ-পরিণাম বলা হয়। ১১নং সূত্রে চিত্তের যে সর্বার্থতা-ধর্মের ক্ষয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হল তার অতীত লক্ষণ-পরিণাম এবং যে একাগ্রতারূপ ধর্মের উদয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হল তার বর্তমান লক্ষণ-পরিণাম। উদয় হওয়ার পূর্বে তা অনাগত লক্ষণ-পরিণাম ছিল। অন্য সমস্ত বস্তুর পরিণামের ক্ষেত্রেও এই একই প্রক্রিয়া বুঝে নিতে হবে।

(৩) অবস্থা-পরিণাম—বর্তমান লক্ষণযুক্ত ধর্মে নতুনত্ব থেকে পুরাতনত্ব আসা-যাওয়া করে অর্থাৎ সেখানে প্রতিক্ষণ পরিবর্তন চলতে থাকে এবং বর্তমান লক্ষণ ত্যাগ করে অতীত লক্ষণে চলে যায়—এ হল লক্ষণের অবস্থা-পরিণাম। ১১নং সূত্রের বর্ণনানুসারে যখন চিত্তরূপ ধর্মীর বর্তমান লক্ষণযুক্ত সর্বার্থতারূপ ধর্ম অবদমিত হয়ে অতীত লক্ষণকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বর্তমানে তার যে ক্রমে ক্রমে সরে যাওয়া তা হল তার অবস্থা-পরিণাম। আবার যে একাগ্রতারূপ ধর্ম অনাগত লক্ষণ থেকে বর্তমান লক্ষণে আসে তখন তার যে উদয় হওয়ার ক্রম, তাও তার অবস্থা-পরিণাম। ১০নং সূত্রে নিরুদ্ধচিত্তের অবস্থা-পরিণামের এবং ১২নং সূত্রে একাগ্রচিত্তের অবস্থা-পরিণামের বর্ণনা আছে। এইভাবে চিত্তের এক অবস্থা ত্যাগ করে

অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকা হল অবস্থা পরিণাম। অবস্থা-পরিণাম প্রতিক্ষণই চলতে থাকে। ত্রিগুণময় বস্তুমাত্রই মুহূর্তের জন্যও এক অবস্থায় থাকে না। এই কথাটাই ১০নং সূত্রে এবং ১২নং সূত্রে নিরোধ-ধর্মের এবং একাগ্রতা-ধর্মের বর্তমান লক্ষণ-পরিণামে এক প্রকারের সংস্কার এবং বৃত্তির ক্ষয় ও উদয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। আমরা বালক অবস্থা থেকে যুবক, যুবক অবস্থা থেকে প্রৌঢ়ত্বে এক দিনে বা এক মুহূর্তে পৌঁছে যাই না। আমাদের এই অবস্থা-পরিণাম অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন প্রতিক্ষণে চলতে চলতে আমরা কোনো একটা অবস্থায় পৌঁছে যাই—একেই বলে অবস্থা-পরিণাম। বিচারের মাধ্যমে এই পরিণামকে বোঝা যায়, সহসা বোঝা যায় না। পরে বলা হবে ক্রমের জ্ঞান হয় পরিণামের অবসানে (যোগ ৪।৩৩)।

ধর্ম-পরিণামে ধর্মীর ধর্মের পরিবর্তন হয়। লক্ষণ-পরিণামে পূর্ববর্তী ধর্মের অতীত হয়ে যাওয়া এবং নতুন ধর্মের বর্তমান হয়ে যাওয়া—এইভাবে ধর্মের লক্ষণ বদলাতে থাকে। অবস্থা-পরিণামে ধর্মের বর্তমান লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকা-কালীনই তার অবস্থা বদলাতে থাকে। প্রথম পরিণাম অপেক্ষা দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম, আবার দ্বিতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টি সূক্ষ্ম॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*ধর্ম এবং ধর্মীর বিবেচন (পৃথক্করণ) করার জন্য ধর্মীর স্বরূপ বলছেন :*

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী॥ ১৪ ॥

শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী=অতীত, বর্তমান ও আগামী ধর্মে যা অনুগত (ব্যাপ্ত) থাকে (আধাররূপে বিদ্যমান থাকে) তা হল ; **ধর্মী**=ধর্মী।

ব্যাখ্যা—দ্রব্যসমূহে সদা বিদ্যমান থাকা বিভিন্ন শক্তির নাম ধর্ম আর সেই ধর্মের আধারভূত দ্রব্যের নাম ধর্মী অর্থাৎ যে কারণরূপ পদার্থের দ্বারা যা তৈরি হয়ে চলেছে, যা তৈরি হয়ে গেছে এবং যা তৈরি হতে পারে তা সবই তার ধর্ম। এক ধর্মীর মধ্যেই এমন অনেক ধর্ম বিদ্যমান থাকে তথা নিজ নিজ নিমিত্ত প্রাপ্ত হলে প্রকট ও শান্ত হতে থাকে। এরা তিন প্রকার—

(১) অব্যপদেশ্য—যে ধর্ম ধর্মীর মধ্যে শক্তিরূপে থাকে অথচ ব্যবহারে না আসার কারণে নির্দিষ্টভাবে তাকে নির্দেশ করা যায় না তাকে 'অব্যপদেশ্য' বলা হয়। একে 'অনাগত'ও বলা হয়। এই অব্যপদেশ্য ধর্ম বা অনাগত শক্তি খুবই সূক্ষ্ম। যেমন—জলের মধ্যে বরফ, মৃত্তিকার মধ্যে পাত্র, বীজের মধ্যে বৃক্ষ অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বেই অনাগত শক্তি রূপে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

(২) উদিত—যে ধর্ম পূর্ব হতেই শক্তিরূপে ধর্মীর মধ্যে গুপ্ত ছিল, নিজ কার্য উপলক্ষ্যে যখন তা প্রকট হয় তখন তাকে উদিত বলা হয়। একে 'বর্তমান'ও বলা হয়ে থাকে। যেমন, জলের মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান থেকে বরফরূপে প্রকট হওয়া হল জলের বর্তমানরূপ (বরফ) ধারণ করা। মৃত্তিকার মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান থেকে পাত্র হয়ে প্রকট হওয়া হল বর্তমানরূপে (পাত্র) আসা।

(৩) যে ধর্ম আপন কার্য সমাপ্ত করে ধর্মীর মধ্যে বিলীন হয় সে ধর্মের নাম 'শান্ত'। একে 'অতীত'ও বলা হয়। যেমন, বরফের গলে জলে বিলীন হয়ে যাওয়া বা ঘটের ভেঙে মৃত্তিকায় মিশে যাওয়া।

অতএব অব্যপদেশ্য, উদিত ও শান্ত—এই তিন স্থিতিতেই ধর্মী সদা অনুগত থাকে। কোনো কালেই ধর্মী বিনা ধর্ম থাকে না॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ—*একই ধর্মীর ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম-পরিণাম কেমন করে হয়, তা বলছেন—*

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ॥ ১৫ ॥

পরিণামান্যত্বে=পরিণামের ভিন্নতায় ; **ক্রমান্যত্বং**=ক্রমের ভিন্নতা ; **হেতুঃ**=(হল) কারণ।

ব্যাখ্যা—একই দ্রব্যের কোনো এক ক্রমের বশে যে পরিণাম হয়, দ্বিতীয় ক্রমে তার থেকে ভিন্ন অন্য এক পরিণাম হয়, অন্য ক্রম থেকে আবার তৃতীয় পরিণাম হয়। যেমন, তুলো থেকে বস্ত্র তৈরি করতে হলে প্রথমতঃ সুতো করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় এবং তারপর

আরও বহুবিধ খুঁটিনাটি প্রক্রিয়া যথাযথ ক্রমানুসারে অনুষ্ঠিত হলে অবশেষে তা থেকে বস্ত্র নির্মিত হয়। যদি তুলো থেকে প্রদীপের সলতে বানাতে হয় তবে একটুখানি তুলো নিয়ে হাতের তালুতে পাকিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ সলতে তৈরি হয়ে যাবে। যদি কুয়ো থেকে জল তোলার দড়ি বানাতে হয় তবে আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি ক্রম অনুসরণ করতে হয়। যে ধরনের বস্ত্র, যে ধরনের সলতে, যে ধরনের দড়ি বানাতে হবে তার ক্রমেও তেমন তেমন ভেদ হবে। অন্য সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রেও এই একই প্রক্রিয়া বুঝে নিতে হবে।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে ক্রমের পরিবর্তন ঘটলে একই ধর্মী ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপযুক্ত ধর্মীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। পরিণামের এই ভিন্নতার হেতু বা কারণ, কেবলমাত্র ক্রমের ভিন্নতা, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। ক্রমের ভিন্নতা সহকারী কারণসমূহের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে হয়ে থাকে। যেমন, শীতলতার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে জলে বরফরূপ ধর্মের প্রকট হওয়ার ক্রম চলতে থাকে কিংবা গরমের সংযোগে স্টিম (বাষ্প) তৈরি হওয়ার ক্রম আরম্ভ হয়ে যায়॥ ১৫ ॥

সম্বন্ধ——*কোনো ধ্যেয় বস্তুতে এই সংযমের সিদ্ধি অধিগত করে নিতে পারলে তা থেকে কী ধরনের ফললাভ হয় তার বর্ণনা এখন থেকে এই পাদের সমাপ্তি পর্যন্ত করা হয়েছে। একেই যোগের 'বিভূতি' অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মহত্ত্ব বলা হয়।*

(যোগীর উচিত এর সমস্ত কিছু বুঝে নিয়ে নিজের জন্য যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ ফল বলে মনে হবে তাকে বেছে নেওয়া)

উপরে তিন ধরনের পরিণামের বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে এগুলিতে সংযম করার ফল বলছেন—

পরিণামত্রয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্॥ ১৬ ॥

পরিণামত্রয়সংযমাৎ=(উক্ত) তিন পরিণামে সংযম করলে ; **অতীতানাগতজ্ঞানম্**=অতীত ও অনাগতের (ভবিষ্যতে যা ঘটবে) জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম—এই তিন প্রকার পরিণামের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। ওই তিন পরিণামের উপর সংযম প্রয়োগ করলে অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধ করে নিতে পারলে যোগী পূর্ববৃত্তান্ত ও ভবিষ্যবৃত্তান্ত জানতে পারেন। অভিপ্রায় এই যে, যখন কোনো বর্তমান বস্তুর বিষয়ে যোগী সেই বস্তুর মূল কারণ এবং তার পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়া জানতে চান, জানতে চান বর্তমান রূপ নিতে তার কতকাল লেগেছে এবং ভবিষ্যতে তার কী ধরনের পরিবর্তন হবে এবং কতদিনে কীভাবে সে আপন কারণে বিলীন হবে ? —তখন উক্ত তিন পরিণামে সংযম প্রয়োগ করলে সমস্তই তাঁর সামনে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হয়॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধ—*এই রকমেই অপর বিভূতিগুলির বর্ণনা করছেন :*

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সংকরস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ ১৭ ॥

শব্দার্থপ্রত্যয়ানাম্=শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনের ; **ইতরেতরাধ্যাসাৎ**= একের মধ্যে অন্যের অধ্যাসবশতঃ ; **সংকরঃ**=যে মিশ্রণ হয়ে চলেছে ; **তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ**=তার বিভাগ অর্থাৎ পৃথক্‌রূপে বোধের বিষয়ে সংযম পালন করলে ; **সর্বভূতরুতজ্ঞানম্**=সমস্ত প্রাণির ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—বস্তুর নাম, রূপ, জ্ঞান—এই তিনটি পরস্পর থেকে পৃথক। কিন্তু ব্যবহারকালে লোকে উক্ত তিন পদার্থকে পৃথক করে ব্যবহার করে না, অবিভক্ত বা একরূপেই ব্যবহার করে। যেমন, 'ঘট' এই শব্দটি মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি যে পদার্থের সংকেত করছে সেই পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। এইভাবে ওই ঘটরূপ পদার্থের যে প্রতীতি বা ধারণা জন্মায়—তা চিত্তের বৃত্তিবিশেষ। সেইজন্য সেটিও ঘটরূপ পদার্থ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। কারণ শব্দ বাকশক্তির ধর্ম, ঘটরূপ পদার্থ মৃত্তিকার ধর্ম আর বৃত্তি হল চিত্তের ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক। তথাপি এই তিনের পরস্পর অধ্যাসের ফলে

মিশ্রণ হয়ে থাকে। যখন যোগী বিচার করে এদের পৃথকত্ব বুঝে নিয়ে সেই পার্থক্যে সংযম করেন তখন তিনি সমস্ত প্রাণীর শব্দ বা ডাকের অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন[১]॥ ১৭ ॥

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্॥ ১৮ ॥

সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ=(সংযম দ্বারা) সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয়ে গেলে ; **পূর্বজাতিজ্ঞনম্**=পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—প্রাণী যা কিছু কর্ম করে এবং ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি দ্বারা যা কিছু অনুভব করে, তা সমস্তই সংস্কাররূপে তার অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে। উক্ত সংস্কার দু ধরনের হয়—এক, বাসনারূপ যা হল স্মৃতির কারণ। দ্বিতীয়, ধর্মাধর্মরূপ যা হল জাতি, আয়ু ও ভোগের কারণ। এই দুই ধরনের সংস্কার বহু জন্মজন্মান্তর ধরে সঞ্চিত হয়ে চলেছে (যোগ. ২।১২, ৪।৮-১১)। ওই সংস্কারের উপর সংযম প্রয়োগ করে তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে যোগী পূর্বজন্মবৃত্তান্ত জানতে পারেন। যেমন, নিজের পূর্ব সংস্কারের সাক্ষাৎকারের দ্বারা নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের জ্ঞান জন্মায় তেমনি অপরের সংস্কারের উপর সংযম করলে তার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হতে পারে॥ ১৮ ॥

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্॥ ১৯ ॥

প্রত্যয়স্য=(সংযম দ্বারা) অপরের চিত্তের (সাক্ষাৎকার করলে) ; **পরচিত্তজ্ঞানম্**=অপরের চিত্তের জ্ঞান (হয়)।

ব্যাখ্যা—এই সূত্রের শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুকৃত অর্থ হল যে সংযম দ্বারা নিজ চিত্তবৃত্তির সাক্ষাৎকার করতে পারলে যোগী সংকল্পমাত্রই অন্যের চিত্ত

---

[১]যে সংযমের যেই ফল সূত্রকার উল্লেখ করেছেন, আমি সেটি অনুবাদমাত্র করেছি। সেই সংযমের ফল কীভাবে হয়, কেন হয়, সেটি আমার বুদ্ধির অগম্য। কেননা আমি যোগী নই এবং উপরোক্ত কোনো সংযমে সিদ্ধিলাভ করে তার ফল উপলব্ধি করিনি। এমতাবস্থায় এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে উচিত হবে না।

সম্বন্ধে জানতে পারেন যে সেই মুহূর্তে সে কোন কোন বিষয়ের চিন্তনে ব্যাপৃত, এই মুহূর্তে ওই চিত্ত প্রক্ষিপ্ত, মূঢ় অথবা প্রশান্ত ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য টীকাকারগণ এই অর্থ স্বীকার করেন না।

এই গ্রন্থে প্রায়শঃই চিত্তের বৃত্তিবিশেষকে অথবা জ্ঞানকে প্রত্যয় নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে অন্যান্য টীকাকারগণ প্রত্যয়ের অর্থ চিত্তবৃত্তি না বলে কেবল চিত্ত বলেছেন, কেননা এই সূত্রে তার সাক্ষাৎকারের ফল চিত্তের জ্ঞান বলে জানানো হয়েছে এবং পরের সূত্রে বৃত্তিসহ জ্ঞানের নিষেধ করা হয়েছে, তথা এই সূত্রে এটা স্পষ্ট নয় কোন্ চিত্তসাক্ষাৎকারের ফলের কথা বলা হয়েছে (যোগীর নিজের না অন্যের)। কিন্তু ফলনির্দেশে পরশব্দের প্রয়োগ দেখে অন্যের চিত্তের সাক্ষাৎকার বলে মনে করা হচ্ছে। যাই হোক, এখানে বিষয়টি যথাযথভাবে বোধগম্য হচ্ছে না॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ——*এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন :*

ন চ তৎসালম্বনং তস্যাবিষয়ীভূতত্বাৎ॥ ২০ ॥

চ=কিন্তু ; **তৎ**=সেই জ্ঞান ; **সালম্বনম্**=আলম্বনসহ (অবলম্বন) ; **ন**= হয় না ; **তস্য অবিষয়ীভূতত্বাৎ**=কেননা (সেই চিত্ত) যোগীর চিত্তের বিষয় নয়।

ব্যাখ্যা——চিত্তের সাক্ষাৎকারের দ্বারা যোগীর পরচিত্তের যে জ্ঞান হয় তা কেবলমাত্র চিত্তের স্বরূপমাত্রেরই হয়। সেই চিত্তের আলম্বনের অর্থাৎ তার চিত্ত যা ভাবছে, তার জ্ঞান হয় না। কারণ যোগীর চিত্তের বিষয় পরের চিত্ত, তার আলম্বন নয়।

সম্বন্ধ——*এখন আরেকটি সিদ্ধির বর্ণনা করছেন :*

কায়রূপসংযমাৎ তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃপ্রকাশা-সম্প্রয়োগেঽন্তর্ধানম্॥ ২১ ॥

কায়রূপসংযমাৎ=শরীরের রূপে সংযম করলে ; **তদ্‌গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে**= যখন তার গ্রাহ্যশক্তিকে অবরোধ করা হয়, তখন ;

চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগে=চক্ষুর প্রকাশের সঙ্গে তার সম্পর্ক না হওয়ার জন্য ; **অন্তর্ধানম্**=যোগী অন্তর্ধান করেন।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী স্বীয় শরীরের রূপের প্রতি সংযম করেন, তখন তিনি অন্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য নিজ শরীরের দৃশ্যতাশক্তিকে সংকল্পমাত্র বাধা দিতে পারেন। তাঁর এই অবরোধ শক্তির দ্বারা অন্যের চক্ষুর প্রকাশশক্তির সঙ্গে তার সংযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং তাঁকে কেউ দেখতে পায় না, এর নাম অন্তর্ধান।

এইভাবে যদি যোগী শব্দের উপর সংযম করেন তখন তাঁর শব্দকে কেউ শুনতে পায় না। যদি শরীরের স্পর্শে সংযম করেন তাহলে তাঁকে কেউ স্পর্শ করতে পারে না ইত্যাদি সিদ্ধিগুলোও উপলক্ষণের দ্বারা বুঝে নিতে হবে॥ ২১ ॥

সম্বন্ধ— *অন্য সিদ্ধির বর্ণনা করছেন :*

সোপক্রমং নিরুপক্রমং চ কর্ম তৎসংযমাদ-
পরান্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা॥ ২২॥

সোপক্রমম্=উপক্রমসহ (আরম্ভ) ; চ=এবং ; **নিরুপক্রম্**=উপক্রমরহিত—এই দুই প্রকার ; **কর্ম**=কর্ম হয় ; **তৎসংযমাৎ**=এর প্রতি সংযম পালন করলে (যোগীর) ; **অপরান্তজ্ঞানম্**=মৃত্যুর জ্ঞান হয় ; **বা**=অথবা ; **অরিষ্টেভ্যঃ**=অরিষ্টের (অরিষ্ট নামক কতগুলো লক্ষণ) দ্বারা (যোগীরা মৃত্যুকাল উপলব্ধি করতে পারেন)।

ব্যাখ্যা—যে কর্মের ফলস্বরূপ মানুষের আয়ু নির্দিষ্ট হয় তা দুই প্রকার—(১) সোপক্রম—যার কর্মফল আরম্ভ হয়েছে, (২) নিরুপক্রম—যার ফল ভোগ আরম্ভ হয়নি। এই দুই প্রকার কর্মে সংযম প্রয়োগ করে যোগী প্রত্যক্ষ করেন যে কোন কোন কর্ম নির্দিষ্ট ফলের কতটা প্রদান করেছে আর কোন কর্মের কতটা ফলভোগ বাকি এবং এদের গতির হিসাবে কতদিনে দুপ্রকার কর্মের সমাপ্তি হবে, তখন তাঁর মৃত্যুর দিন অর্থাৎ শরীর নাশের কাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়ে যাবে।

এছাড়া অরিষ্টের দ্বারা অর্থাৎ অশুভ চিহ্নের দ্বারাও মৃত্যুর কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, অনুমান মাত্র॥ ২২ ॥

মৈত্র্যাদিষু বলানি॥ ২৩ ॥

মৈত্রী আদিষু= মৈত্রী আদি ভাবনাতে (সংযম করলে) ; **বলানি**= বল পাওয়া যায় (মৈত্রী আদি বিষয়ে)।

ব্যাখ্যা—পূর্বে (যোগ. ১।৩৩) মৈত্রী, করুণা, মুদিতা—এই তিন প্রকারের ভাবনার বর্ণনা আছে। চতুর্থ হল উপেক্ষা—এটি ভাবনা নয়, ভাবনার ত্যাগ। এদের মধ্যে প্রথমটিতে, অর্থাৎ সুখী মানুষের মধ্যে যে মিত্রতার ভাবনা আছে তাতে সংযম করলে যোগীর মধ্যে মিত্রতার সামর্থ্য এসে যায় অর্থাৎ তিনি সকলের মিত্র হন এবং সকলকে সুখ দেন। দ্বিতীয়টিতে, দুঃখী মানুষের প্রতি করুণার ভাবনার উপর সংযম করলে যোগীর করুণাবল লাভ হয়। তিনি পরম দয়ালু হন এবং প্রত্যেক প্রাণীর দুঃখ দূর করতে সমর্থ হন। তৃতীয়টিতে, পুণ্যাত্মা মানুষের মধ্যে যে মুদিতার (প্রসন্নতার) ভাবনা আছে সেখানে সংযম করলে মুদিতার বল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগী সর্বথা ঈর্ষ্যা-দ্বেষ শূন্য হন এবং সদা প্রসন্ন থাকেন। কোনো পরিস্থিতি (ভালো-মন্দ) তাঁর মনে কিঞ্চিৎমাত্র বিকার উদ্রেক করে না, ভয় শোকের বৃত্তি উৎপন্ন করে না এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্যকেও প্রসন্নতা দেয়॥ ২৩ ॥

বলেষু হস্তিবলাদীনি॥ ২৪ ॥

বলেষু=(ভিন্ন ভিন্ন) বলে (সংযম করলে) ; **হস্তিবলাদীনি**=হাতি প্রভৃতি প্রাণীর বলের সদৃশ বলে (সংযম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের) বলীয়ান হন।

ব্যাখ্যা—যোগী যদি হাতির বলের উপর সংযম করেন তবে তিনি হস্তিসদৃশ বল প্রাপ্ত হন। যদি গরুড়ের বলের উপর সংযম করেন তবে গরুড়ের মতো বলশালী হন। যদি বায়ুর শক্তিতে সংযম করেন তাহলে বায়ুসদৃশ বলবান হন। এইভাবে যোগী সিংহ, ব্যাঘ্র, হনুমান প্রভৃতি বলশালীর বলে সংযম করলে সেই-সেই বলিষ্ঠ জীব বা দেবতার বলে

বলীয়ান হন॥ ২৪ ॥

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্॥ ২৫ ॥

প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ=জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির প্রকাশের প্রয়োগ করলে ; **সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্**=সূক্ষ্ম ব্যবধানযুক্ত ও দূরদেশে স্থিত বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—তিন ধরনের বস্তুর প্রত্যক্ষ সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে হয় না। (১) অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু। যেমন, পরমাণু, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি প্রভৃতি। (২) ব্যবহিত অর্থাৎ কোনো কিছুর অন্তরালে অবস্থিত বস্তু। যেমন, সমুদ্রে রত্ন, খনিতে মণি, স্বর্ণ ইত্যাদি। (৩) বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরদেশে অবস্থিত বস্তু। যেমন, আমি আসামে আছি, বস্তুটি রয়েছে মহারাষ্ট্রে অথবা আমি ভারতে, বস্তু রয়েছে আমেরিকায়। যোগী যখন যে বস্তুটির অবস্থান জানতে চান তখন তার প্রতি জ্যোতিষ্মতী বা প্রকাশবতী প্রবৃত্তির প্রকাশ নিক্ষেপ করেন এবং তৎক্ষণাৎ বস্তুটির অবস্থান তাঁর সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। প্রথম পাদের ৩৬ নং এবং ৪৭নং সূত্রে এবং এই পাদের ৫নং সূত্রে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে॥ ২৫ ॥

ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ॥ ২৬ ॥

সূর্যে=সূর্যে ; **সংযমাৎ**=সংযম করলে ; **ভুবনজ্ঞানম্**=সমস্ত লোকের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—পুরাণে চৌদ্দ ভুবনের বর্ণনা আছে। তাদের মধ্যে একটি হল ভূলোক। সূর্যে চিত্ত সংযম করলে চৌদ্দ ভুবনের জ্ঞান জন্মে। ব্যাসভাষ্যে ওই সমস্ত লোকের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার পথে এগুলি সেরূপ প্রয়োজনীয় নয় বলে এখানে এদের বর্ণনা করা আমার উচিত মনে হয়নি। তা ছাড়াও এই বর্ণনাগুলি ঠিক ঠিক বোধগম্যও হয় না॥ ২৬ ॥

চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানম্॥ ২৭ ॥

চন্দ্রে=চন্দ্রে (সংযম করলে) ; **তারাব্যূহজ্ঞানম্**=সমস্ত তারাদের ব্যূহ

(স্থিতি বিশেষ) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—চন্দ্রমায় সংযম করলে কোন তারা কোন্ স্থানে অবস্থান করছে সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায়॥ ২৭ ॥

সম্বন্ধ—*এরপর*—

ধ্রুবে তদ্‌গতিজ্ঞানম্॥ ২৮ ॥

ধ্রুবে=ধ্রুবতারায় (সংযম করলে) ; **তদ্‌গতিজ্ঞানম্**=তারাদের গতি জানা যায়।

ব্যাখ্যা—ধ্রুবতারা নিশ্চল। তারকাসমূহের গতির সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে। অতএব ধ্রুবতারায় সংযম করলে তারাদের গতির অর্থাৎ কোন্ তারা কোন্ সময়ে কোন্ রাশিতে গমন করবে—সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়॥ ২৮ ॥

নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে=নাভিচক্রে (সংযম করলে) ; **কায়ব্যূহজ্ঞানম্**=শরীরের ব্যূহ (তার স্থিতি) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়।

ব্যাখ্যা—নাভিচক্রের সঙ্গে শরীরের সমস্ত নাড়ী সংযুক্ত রয়েছে। সেই নাভিচক্রে সংযম করলে কায়ব্যূহ অর্থাৎ শরীরের গঠন, সেখানে কী ধরনের ধাতু কোথায় কীভাবে স্থিত আছে—যোগী সে-সমস্তই জানতে পারেন। এছাড়া নাড়ীসমূহ সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেন॥ ২৯ ॥

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ॥ ৩০ ॥

কণ্ঠকূপে=কণ্ঠকূপে (সংযম করলে) ; **ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ**=ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—জিহ্বার নীচে যে তন্তু আছে তাকে জিহ্বামূল বলা হয়। তার নীচে আছে কণ্ঠ, কণ্ঠের নীচে আছে কূপ (গহ্বর)। কণ্ঠকূপে প্রাণবায়ুর স্পর্শ হলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভূত হয়। যোগী যখন উক্তস্থানে সংযম প্রয়োগ করেন তখন যোগীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়॥ ৩০ ॥

কূর্মনাড্যাং স্থৈর্যম্ ॥ ৩১ ॥

কূর্মনাড্যাম্=কূর্মাকার (নাড়ীতে সংযম করলে) ; **স্থৈর্যম্**=স্থিরতা আসে।

ব্যাখ্যা—উক্ত কূপের নীচে বক্ষঃস্থলে কচ্ছপের আকৃতিবিশিষ্ট নাড়ী আছে। উক্ত নাড়ীতে সংযম প্রয়োগ করলে স্থিরতা লাভ হয় অর্থাৎ চিত্ত ওই কূর্ম নাড়ীতে প্রবিষ্ট হলে শরীর ও মনে স্থিরতা আসে॥ ৩১ ॥

মূর্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্॥ ৩২ ॥

মূর্ধজ্যোতিষি=মূর্ধাজ্যোতিতে (সংযম করলে) ; **সিদ্ধদর্শনম্**=সিদ্ধ পুরুষের দর্শন হয়।

ব্যাখ্যা—মাথার খুলির ঠিক মাঝখানে ব্রহ্মরন্ধ্র নামক একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সেখানে চৈতন্যজ্যোতির নিত্য উদ্‌ভাস। সেই মূর্ধাজ্যোতিতে যোগী যখন সংযম করেন তখন তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালবাসী সিদ্ধমহাপুরুষগণকে দর্শন করতে সমর্থ হন॥ ৩২ ॥

প্রাতিভাদ্বা সর্বম্॥ ৩৩ ॥

বা=অথবা ; **প্রাতিভাৎ**=প্রাতিভ জ্ঞান উৎপন্ন হলে (সংযম ব্যতীত) ; **সর্বম্**=(যোগী পূর্বে উল্লিখিত) সমস্ত কিছু বিদিত হন।

ব্যাখ্যা—প্রাতিভ জ্ঞানের বর্ণনা এই পাদের ৩৬নং সূত্রে করা হয়েছে। এটি হল বিবেকজনিত জ্ঞানের পূর্ণরূপ। সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন তার প্রভা আবির্ভূত হয় আর সেই প্রভায় মানুষ সবকিছু দেখতে পায়, তেমনি প্রাতিভ জ্ঞান উৎপন্ন হলে যোগী সমস্ত কিছু বিদিত হন॥ ৩৩ ॥

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে=হৃদয়ে (সংযম করলে) ; **চিত্তসংবিৎ**=চিত্তের স্বরূপের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মপুর নামক হৃদয়প্রদেশে গর্তের আকৃতিসদৃশ যে পদ্ম আছে, তা হল চিত্তের স্থান। সেখানে সংযম করলে বৃত্তিসহ চিত্তের জ্ঞান

হয়॥ ৩৪ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্তের স্বরূপের জ্ঞান হলে বিবেক জাগ্রত হয় এবং পুরুষের স্বরূপের জ্ঞান হয়। সেইজন্য পরের সূত্রে বলছেন*—

সত্ত্বপুরুষয়োরত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থাৎস্বার্থসংযমাৎপুরুষজ্ঞানম্॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃঅত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ=সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও পুরুষ—যা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন (কোনোভাবেই মিলিত হতে পারে না)—এই দুইয়ের ; **প্রত্যয়াবিশেষঃ**=অভেদরূপে যে প্রতীতি ; **ভোগঃ**=তা (হল) ভোগ ; তারমধ্যে ; **পরার্থৎ স্বার্থসংযমাৎ**=পরার্থ প্রতীতি (পুরুষে আরোপিত) থেকে ভিন্ন যে স্বার্থ-প্রতীতি (অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখন কেবল চৈতন্যের সত্তা বিরাজ করে, অহংতত্ত্ব থাকে না) আছে সেখানে চিত্তসংযম করলে ; **পুরুষজ্ঞানম্**= পুরুষের (আত্মা) জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—পুরুষ ও বুদ্ধি—উভয়েই সর্বথা ভিন্ন। এদের মধ্যে কোনো মিল নেই। বুদ্ধি হল পরিণামশীল, জড়, ভোগ্য ও চঞ্চল। কিন্তু পুরুষ হল অপরিণামী, চৈতন্যময়, ভোক্তা, অসঙ্গ। অবিদ্যার কারণে দুজনের মধ্যে একতা প্রতীত হয়। এর নাম অস্মিতা (যোগ. ২।৬)। এই একতার জন্যই দুজনের পৃথক রূপে জ্ঞান হয় না ; উভয়ের মিলিতভাবে জ্ঞান হয়। অথচ বুদ্ধি হল জড়, কেবল চৈতন্যময় পুরুষের চেতনায় সে (বুদ্ধি) চেতনের ন্যায় প্রতীত হয়। সেই জড়বুদ্ধিতে মোহ বা সুখ-দুঃখরূপ যে নানাপ্রকার বৃত্তির উদয় হয়, সেই বৃত্তি হল অবিশেষ (অভিন্ন-মিশ্রিত)। কারণ এর দ্বারা চিত্তের ধর্ম—সুখ-দুঃখ-মোহ ইত্যাদি চিত্তে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য পুরুষে অধ্যারোপিত হয়ে থাকে। এই অভেদ প্রতীতি হল ভোগ। এই অভেদরূপ বৃত্তি চিত্তের ধর্ম কিন্তু পর অর্থাৎ পুরুষ তার নিমিত্ত। অতএব তা পরার্থ। এই দশাতেই ভোগ নামক এই পরার্থ প্রত্যয়ের অতিরিক্ত দ্রষ্টাপুরুষের স্বরূপবিষয়ক আর একটি বৃত্তি বা প্রত্যয় আছে—সেই পৌরুষেয় বৃত্তির নাম স্বার্থ। কারণ তার বিষয় কেবলমাত্র পুরুষ এবং তা তারই জন্য। ওই

স্বার্থবৃত্তিতে সংযম করলে পুরুষের জ্ঞান হয়। যদ্যপি জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম, অতএব ওই জ্ঞানের দ্বারা পুরুষকে জানা যায় না, কিন্তু বুদ্ধি যখন কর্তৃভাব (অহংভাব) পরিত্যাগ করে তখন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন, দর্পণে দ্রষ্টার নিজ মুখ দেখার মতো সেখানে কেবল পুরুষ প্রতিভাত হন। একে বলা হয় স্বার্থবৃত্তি। যোগী যখন সেখানে সংযম পালন করেন তখন তাঁর পুরুষবিষয়ক জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার) হয়।[১]

প্রথম পাদের ৪১নং সূত্রে একেই গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধি বলা হয়েছে। এই সমাধির ধ্যেয় 'পুরুষ' অস্মিতার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে প্রথম পাদের ১৭নং সূত্রে একেই অস্মিতানুগত সমাধি নামে অভিহিত করা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়, কারণ, এই অর্থ মেনে নিলে পূর্বাপর সমগ্র প্রসঙ্গটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধিরও নির্বিচারে অন্তর্ভাব মেনে নেওয়া সুসঙ্গত হয়॥ ৩৫ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত সংযমের দ্বারা পুরুষের জ্ঞান হবার পূর্বে যোগীর সামনে যে সমস্ত সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, তা বর্ণনা করছেন—*

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তা জায়ন্তে॥ ৩৬॥

ততঃ=তার (স্বার্থ-সংযম) দ্বারা ; **প্রাতিভশ্রাবণবেদনাদর্শাস্বাদবার্তাঃ**= প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আস্বাদ ও বার্তা—এই (ছয়টি সিদ্ধি) ; **জায়ন্তে**=আবির্ভূত হয়।

ব্যাখ্যা—এই ছয়টি সিদ্ধি গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধির সাধনে ব্যাপৃত সাধক পুরুষজ্ঞান লাভের পূর্বে প্রাপ্ত হন। এগুলির লক্ষণ হল—

(১) **প্রাতিভ**—এর বর্ণনা ৩৩নং সূত্রে করা হয়েছে। এর দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং সূক্ষ্ম, গুপ্ত ও দূরদেশে স্থিত বস্তু প্রত্যক্ষ হয়।

(২) **শ্রাবণ**—এর দ্বারা দিব্যশব্দ শ্রবণের শক্তি আসে।

---

[১]অন্যান্য ভাষ্য ও টীকা অবলোকন করে আমি এর অর্থ বর্ণনা করেছি। তর্ক দ্বারা এটি বোধগম্য হতে পারে না। যাঁরা এই বিষয়টির অনুভব করেছেন তাঁদের নিকট বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(৩) **বেদন**—এর দ্বারা দিব্যস্পর্শের অনুভব করার শক্তি আসে।

(৪) **আদর্শ**—এর দ্বারা দিব্যরূপ দর্শন করার শক্তি আসে।

(৫) **আস্বাদ**—এর দ্বারা দিব্যরস অনুভব করার শক্তি আসে।

(৬) **বার্তা**—এর দ্বারা দিব্যগন্ধ অনুভব করার শক্তি আসে।

সম্বন্ধ—*এইসব সিদ্ধির প্রতি বৈরাগ্য আনার জন্য বলছেন—*

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

তে=ওই সমস্ত (উক্ত ছয় প্রকারের সিদ্ধি) ; **সমাধৌ**=সমাধির সিদ্ধিলাভে (পুরুষের জ্ঞানলাভে) ; **উপসর্গাঃ**=বিঘ্নকারী (ও) ; **ব্যুত্থানে**= ব্যুত্থান সময়ে ; **সিদ্ধয়ঃ**=সিদ্ধিস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—উক্ত ছয়টি সিদ্ধি সাধকের সামনে উপস্থিত হলে তাদের ত্যাগ করা উচিত। কেননা এগুলো সাধকের সাধনে বিঘ্নস্বরূপ। তবে যার চিত্ত চঞ্চল, যে সাধক নয়, যে সমাধি বা আত্মোদ্ধারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে পারে না, সেই ধরনের মানুষ যদি কোনো কারণে এগুলো প্রাপ্ত হয়, তবে তার কাছে তা নিশ্চয়ই সিদ্ধি ॥ ৩৭ ॥

সম্বন্ধ—*এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংযমের দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয়, পুরুষের জ্ঞানলাভ পর্যন্ত সে সবের বর্ণনা করা হয়েছে। এখন ভিন্ন ভিন্ন সংযমের দ্বারা যে বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তি লাভ হয়, তার বর্ণনা আরম্ভ করা হচ্ছে—*

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ=বন্ধনের কারণ (কর্ম) শিথিল হলে ; **চ**=এবং ; **প্রচারসংবেদনাৎ**=চিত্তের গতিবিধির সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হলে ; **চিত্তস্য**= চিত্তের ; **পরশরীরাবেশঃ**=অন্যের শরীরে প্রবেশ (সম্ভব হয়)।

ব্যাখ্যা—চিত্তের বন্ধনের কারণ হল কর্মসংস্কার, কর্মফল ভোগ করার জন্যই চিত্ত কোনো এক শরীরের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যখন মানুষ সমাধির অভ্যাস দ্বারা উক্ত বন্ধনের কারণরূপ কর্মসংস্কারকে শিথিল করে চিত্তকে

স্বচ্ছ ও নির্মল করে তোলে এবং সেই সঙ্গে যে পথে চিত্ত শরীরে বিচরণ করে (আসে-যায়) সেই পথকে ও চিত্তের গতিকে সঠিক জেনে যায় তখন সে নিজের চিত্তকে শরীর থেকে বাইরে নিয়ে এসে অন্যের (জীবিত বা মৃত) শরীরে প্রবিষ্ট করাতে পারে। চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহও তাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ যেখানে চিত্ত সেখানে ইন্দ্রিয় নিজে নিজেই চলে যায়॥ ৩৮ ॥

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষ্বসঙ্গউৎক্রান্তিশ্চ॥ ৩৯ ॥

উদানজয়াৎ=উদান বায়ুকে জয় করতে পারলে ; **জলপঙ্ককন্টকাদিষু**=জল, পঙ্ক ও কণ্টক (কাঁটা) প্রভৃতির সঙ্গে ; **অসঙ্গ**=তার শরীরের সংযোগ থাকে না ; **চ**=এবং ; **উৎক্রান্তিঃ**=(তাঁর) ঊর্ধ্বগতিও লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—শরীরে জীবনের আধার হল প্রাণ। ক্রিয়াভেদে তা প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পাঁচ নামে অভিহিত। তাদের লক্ষণ হল—

(১) প্রাণ—এই পাঁচটির মধ্যে প্রাণ হল প্রধান। মুখ এবং নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ু সঞ্চালন করে। নাসিকার অগ্রভাগ থেকে হৃদয় পর্যন্ত এটি চলাচল করে।

(২) অপান—এর গতি নিম্নাভিমুখী অর্থাৎ নাভি থেকে পাদদেশ পর্যন্ত। মূত্র, বিষ্ঠা ও গর্ভ ইত্যাদি এর বেগে নীচের দিকে যায়।

(৩) সমান—হৃদয়দেশ থেকে নাভি পর্যন্ত এটি সঞ্চরণ করে। এটির গতি সম এবং খাদ্য বস্তুর সার ভাগ সমগ্র দেহে সমানবায়ুর দ্বারা পৌঁছে যায়।

(৪) ব্যান—এটি সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত নাড়ীতে সঞ্চরণ করে।

(৫) উদান—এটি ঊর্ধ্বগামী। কণ্ঠ থেকে মস্তক পর্যন্ত এটি সঞ্চারিত হয়। এরই সাহায্যে মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম শরীর উৎক্রান্ত হয় (দ্রষ্টব্য প্রশ্নোপনিষদ ৩।৫-৭)।

যখন যোগী উদান বায়ুকে জয় করেন তখন তাঁর শরীর তুলোর মতো হালকা হয়ে যায় ; তখন তিনি জল, পাঁক ও কাঁটার উপর দিয়ে অনায়াসে

বিচরণ করতে পারেন অর্থাৎ জলে তুলোর মতো ভাসতে পারেন। পাঁক ও কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর পা যথাক্রমে পাঁকের ভেতর যায় না বা কাঁটায় প্রবিষ্ট হয় না। তাছাড়াও মৃত্যুকালে তাঁর প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বিশ্বপ্রাণে মিলিত হয় এবং তাঁর শুক্লমার্গে গতি হয়। উপনিষদেও উক্ত ঊর্ধ্বগতির বর্ণনা আছে (দ্রষ্টব্য কঠোপনিষদ্ ২।৩।১৬)॥ ৩৯ ॥

সমানজয়াজ্জ্বলনম্॥ ৪০ ॥

সমানজয়াৎ=(সংযম দ্বারা) সমানবায়ুকে জয় করলে ; **জ্বলনম্**=(যোগীর শরীর) দীপ্তিমান হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—সংযমের সহায়তায় যখন যোগী সমানবায়ুকে জয় করেন, তখন তাঁর শরীর অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত অর্থাৎ অত্যন্ত দেদীপ্যমান (প্রকাশযুক্ত) হয়ে ওঠে ; কারণ জঠরাগ্নি ও সমানবায়ুর সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অতএব সমানবায়ুকে আয়ত্ত করে স্বীয় শরীরে স্থিত জঠরাগ্নির আবরণকে অপসারিত করে যোগী অগ্নিসদৃশ তেজস্বী হয়ে ওঠেন॥ ৪০ ॥

সম্বন্ধ—*পূর্বের ৩৬নং সূত্রে যে ছয়টি সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রাবণ নামক সিদ্ধি লাভের উপায় বলছেন—*

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদ্ দিব্যং শ্রোত্রম্॥ ৪১ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ=শ্রোত্র (কর্ণ) ও আকাশের ; **সম্বন্ধসংযমাৎ**=সম্বন্ধের প্রতি সংযম প্রয়োগ করলে (যোগীর) ; **শ্রোত্রম্**=শ্রোত্র ; **দিব্যম্**=দিব্যতা প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—শব্দগ্রাহক শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় অহংতত্ত্ব হতে উৎপন্ন এবং অহংকারজনিত শব্দতন্মাত্র হতে আকাশের উৎপত্তি। অতএব আকাশ, শব্দ ও শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়—এরা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। শ্রোত্র ও আকাশের মধ্যে নিহিত সম্বন্ধের প্রতি যখন যোগী সংযম প্রয়োগ করেন তখন তাঁর শ্রোত্র - ইন্দ্রিয় দিব্য শক্তি লাভ করে। তখন তিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর শব্দ শ্রবণের ক্ষমতা লাভ করেন এবং দূরদেশে উচ্চারিত শব্দও শুনতে পান। কারণ আকাশ বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সেইজন্য তার অভ্যন্তরে যে কোনো শব্দ

স্পন্দিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। অতএব যাঁর শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক হয়ে যায়, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন যে কোনো শব্দ তিনি শ্রবণ করতে সমর্থ হন॥ ৪১ ॥

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুতূলসমাপত্তেশ্চাকাশ-গমনম্॥ ৪২ ॥

কায়াকাশয়োঃ=শরীর ও আকাশের ; **সম্বন্ধসংযমাৎ**=সম্বন্ধে সংযম পালনের দ্বারা ; **চ**=এবং ; **লঘুতূলসমাপত্তেঃ**=লঘু বস্তুতে (তুলো ইত্যাদিতে) সংযমের দ্বারা ; **আকাশগমনম্**=আকাশে গমন করার শক্তি আসে।

ব্যাখ্যা—শরীর ও আকাশের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাকে সংযমের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করার পর যোগী এই তত্ত্ব ভালোভাবে উপলব্ধি করেন যে শরীরের অঙ্গ কীভাবে সূক্ষ্ম হতে স্থূলে পরিণত হতে পারে এবং পুনরায় কীভাবে স্থূল হতে সূক্ষ্মে উপনীত হয়। এর ফলে তিনি স্বীয় শরীর অত্যন্ত লঘু (হালকা) করে তোলার ক্ষমতা আয়ত্ত করে আকাশ গমনে সমর্থ হন। এইভাবে আবার যখন যোগী সূক্ষ্ম (তুলো বা মেঘ) বস্তুতে সংযম প্রয়োগ করে তদাকার হয়ে যান, তখন তিনি আকাশমার্গে বিচরণ করার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন ॥ ৪২॥

সম্বন্ধ—*এখন জ্ঞানের আবরণ উন্মোচনের উপায় বলছেন :*

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ॥ ৪৩ ॥

বহিরকল্পিতা=শরীরের বাইরে অকল্পিত ; **বৃত্তিঃ**=স্থিতির নাম ; **মহাবিদেহা**=হল মহাবিদেহ ; **ততঃ**=তার ফলে ; **প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ**=বুদ্ধির জ্ঞানশক্তির আবরণের ক্ষয় হয়।

ব্যাখ্যা—শরীরের বাইরে মনের যে স্থিতি তাকে বিদেহ-ধারণা বলা হয়। যখন তা মনের শরীরের মধ্যে থাকাকালীন ভাবনামাত্রে সাধিত হয় তখন তা হয় কল্পিত। কিন্তু যখন শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে বহির্গত মনের বাইরেই স্থিতি লাভ হয়ে যায় তখন তা হল 'অকল্পিত'। কল্পিত

ধারণার অভ্যাসের দ্বারাই অকল্পিত ধারণা সিদ্ধ হয়। একে 'মহাবিদেহা' বলা হয়। এর দ্বারা যোগীর জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হয়ে যায়। এই ধারণা ইন্দ্রিয় ও মনের স্বরূপাবস্থায় সংযমের দ্বারা সাধিত হয় (যোগ. ৩।৪৮)॥ ৪৩ ॥

সম্বন্ধ——*এই পর্যন্ত ফলসহ নানাপ্রকার সংযমের বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম পাদের ৪১নং সূত্রে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা বিষয়ক সবীজ-সমাধির লক্ষণ বলা হয়েছিল। এখন তার ফল বর্ণনা করার জন্য প্রথমে পঞ্চভূতে এবং তজ্জনিত পদার্থে কৃত গ্রাহ্যবিষয়ক সমাধির ফলাফল বলছেন :*

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্ ভূতজয়ঃ॥ ৪৪ ॥

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদ্=(ভূতসমূহের) স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়, অর্থবত্ত্ব——এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় সংযম প্রয়োগের দ্বারা (যোগী) ; **ভূতজয়**=পঞ্চভূতের উপর বিজয় লাভ করেন।

ব্যাখ্যা——পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ——এই পঞ্চভূতের প্রতিটির পাঁচ প্রকার অবস্থা হয়ে থাকে। যেমন——

(১) স্থূলাবস্থা——যে রূপে আমরা ভূতগণকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করি, গীতায় যাকে ইন্দ্রিয়গোচর বলা হয়েছে (১৩।৫) ; ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভবযোগ্য সেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ নামক পাঁচটি বিষয় হল এদের স্থূল অবস্থা।

(২) স্বরূপাবস্থা——ভূতগণের যে লক্ষণ তা হল তাদের স্বরূপাবস্থা। যেমন, পৃথিবীর মূর্তত্ব, জলের তরলতা ও শীতলতা, অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ, বায়ুর গতি ও কম্পন, আকাশের অবকাশ ও সর্বগততা। এ হল পঞ্চভূতের স্বরূপাবস্থা ; কারণ ভূতগণের স্বরূপাবস্থার দ্বারাই এদের ভিন্ন-ভিন্ন সত্তাকে অনুভব করা যায়।

(৩) সূক্ষ্মাবস্থা——ভূতগণের যে কারণ অবস্থা যাকে তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম মহাভূত বলা হয়——তা হল তাদের সূক্ষ্মাবস্থা।

যেমন, পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্র, জলের রসতন্মাত্র, অগ্নির রূপতন্মাত্র, বায়ুর স্পর্শতন্মাত্র এবং আকাশের শব্দতন্মাত্র।

(৪) অন্বয়-অবস্থা——পঞ্চভূতের মধ্যে যে তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ,

তমঃ)-এর স্বভাব বর্তমান অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে—তা হল তাদের অন্বয় অবস্থা।

(৫) অর্থবত্ত্ব-অবস্থা—এই পঞ্চভূত পুরুষকে ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রদানকারী—এ হল তাদের অর্থবত্ত্ব (প্রয়োজনীয়তা) অবস্থা।

এই পঞ্চভূতের প্রত্যেক অবস্থাকে প্রথমে স্থূলরূপে জয় করতে হয়, তারপরে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য অবস্থার উপর সংযম প্রয়োগ করে যখন যোগী এদের প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন, তখন তিনি ভূতজয়ী হন অর্থাৎ সমস্ত ভূত তাঁর বশীভূত হয়॥ ৪৪ ॥

সম্বন্ধ—*এইভাবে যখন যোগী ভূতজয়ী হন তখন কী হয় তা বলছেন*—

ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তদ্ধর্মানভিঘাতশ্চ॥ ৪৫ ॥

ততঃ=এর (ভূতজয়) দ্বারা ; **অণিমাদিমাপ্রাদুর্ভাবঃ**=অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধির প্রাদুর্ভাব ; **কায়সম্পৎ**=কায়সম্পদ প্রাপ্তি ; **চ**=এবং ; **তদ্ধর্মানভিঘাতঃ**=ভূতসমূহের ধর্ম থেকে কোনোরূপ বাধা না হওয়া (এই তিনটি দেখা দেয়)।

ব্যাখ্যা—(ক) উপরিউক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির নাম ও লক্ষণ হল—

(১) অণিমা—অণুসদৃশ সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করা। যেমন, হনুমান সুরসার মুখে প্রবেশকালে এবং লঙ্কায় প্রবেশ করার সময় ধারণ করেছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ১।১৫৬, ২।৪৭)।

(২) লঘিমা—শরীরকে লঘু বা হালকা করার সামর্থ্য। তার ফলে জল, কাদা, কাঁটা বাধার সৃষ্টি করে না (যোগ. ৩।৩৯) এবং আকাশভ্রমণের শক্তিও হয় (যোগ. ৩।৪২)।

(৩) মহিমা—শরীরকে বৃহৎ করার সামর্থ্য। যেমন, হনুমান সুরসার সামনে বৃহৎ আকার ধারণ করেছিলেন (বাল্মীকি রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড ১।১৫৪)।

(৪) গরিমা—শরীরকে গুরুভার করে তোলা। যেমন, হনুমান ভীমসেন-এর পথরোধ করার সময় শরীরকে অত্যন্ত ভারী করে তুলেছিলেন

(মহাভারত, বনপর্ব ১৪৬-১৪৭)।

(৫) প্রাপ্তি—ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ভৌতিক পদার্থ সংকল্পমাত্রে প্রাপ্ত হওয়া।

(৬) প্রাকাম্য—বিনা বাধায় ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধীয় ইচ্ছার অনায়াসে পূর্তি হওয়া।

(৭) বশিত্ব—পঞ্চভূত এবং যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ যোগীর বশীভূত হওয়া।

(৮) ঈশিত্ব—ভূত ও ভৌতিক পদার্থকে নানারূপে উৎপন্ন করার শক্তি ও তাদের শাসন করার সামর্থ্য।

(খ) কায়সম্পদের বিবরণ পরের সূত্রে দেওয়া হয়েছে।

(গ) ভূতের ধর্ম থেকে কোনো বাধা না হওয়া—এর অর্থ ভূতের ধর্ম যোগীর কর্মে কোনো বাধা উৎপন্ন করতে পারে না। যেমন—তিনি পৃথিবীর মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারেন, পৃথিবীর ধর্ম স্থূলভাব (মূর্তত্ব) তাঁকে বাধাদান করতে পারে না, তাঁর শরীরে পাথরের বর্ষণ ঘটালেও তা তাঁকে আঘাত করতে পারে না। একইভাবে জলের সিক্ততা তাঁর শরীরকে আর্দ্র করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতি প্রকৃতির কোনো ধর্ম তাঁর শরীরে কোনোভাবে কোনো অসুবিধা বা পীড়া উৎপন্ন করতে পারে না।

৪৪নং সূত্রানুযায়ী ভূতের সমস্ত অবস্থার উপর বিজয় লাভ করতে পারলে যোগী উপরিউক্ত সমস্ত সিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৫ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত কায়সম্পদের ব্যাখ্যা সূত্রকার স্বয়ং করছেন—*

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননত্বানি=রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রসম সংগঠন ; **কায়সম্পৎ**=হল শরীরের সম্পদ।

ব্যাখ্যা—অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি, অঙ্গকান্তি, বল ও বজ্রসম শরীরের দৃঢ়তা—এই চারটি হল কায়সম্পদ ॥ ৪৬ ॥

সম্বন্ধ—*এখন মনসহ ইন্দ্রিয়সমূহে সম্পাদিত গ্রহণ বিষয়ক সমাধির*

ফলের বর্ণনা করছেন :

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণস্বরূপাস্মিতান্বয়ার্থবত্ত্বসংযমাৎ=গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব—এই পাঁচ অবস্থায় সংযম করলে ; **ইন্দ্রিয়জয়ঃ**=মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয় লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—মনসহ ইন্দ্রিয়গুলির পাঁচটি অবস্থা হয়। ক্রমান্বয়ে সেগুলির উপর সংযম করলে যোগী ইন্দ্রিয়জয়ী হন। সেই পাঁচটি অবস্থা হল—

(১) গ্রহণ—বিষয়কে গ্রহণ করার সময় বৃত্তিরূপে মনসহ ইন্দ্রিয়ের যে অবস্থা তা হল তাদের গ্রহণ-অবস্থা।

(২) স্বরূপ—মন ও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক স্বরূপ যা নিজ নিজ স্থানে বিদ্যমান থাকে এবং লক্ষণের (সংকেত) দ্বারা জানা যায়—তা হল তার স্বরূপ-অবস্থা।

(৩) অস্মিতা—এটি হল মনসহ দশ ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মস্বরূপ। এর দ্বারাই মনসহ দশটি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। এটি হল তাদের (মন-ইন্দ্রিয়াদির) সূক্ষ্মাবস্থা।

(৪) অন্বয়—মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যে তিন গুণের অনুগত স্বভাব অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বিদ্যমান আছে—তা হল তাদের অন্বয়-অবস্থা।

(৫) অর্থবত্ত্ব—মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পুরুষকে ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করার যে সামর্থ্য—তা হল তাদের অর্থবত্ত্ব-অবস্থা (সার্থকতা)।

এইভাবে মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ অবস্থার উপর যোগী ক্রমান্বয়ে সংযম পালন করে সম্পূর্ণভাবে সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ করেন তখন তাদের উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার জন্মায়।

মন ও ইন্দ্রিয়—অহংকার হতে উৎপন্ন। মন এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগে পুরুষ বিষয়কে গ্রহণ করে অথবা একাকী মনের দ্বারা করে। অতএব ইন্দ্রিয়-জয় বলতে মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর অধিকার প্রাপ্তি বোঝায়। মন

ও অস্মিতা বিষয়ে কৃত সমাধিও গ্রহণ সম্পর্কে কৃত সমাধির অন্তর্গত বলে বুঝে নিতে হবে ॥ ৪৭ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত ইন্দ্রিয়-জয়ের ফল বলছেন :*

ততো মনোজবিত্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ততঃ=তার (ইন্দ্রিয়-জয়) দ্বারা ; **মনোজবিত্বম্**=মনের সদৃশ গতি ; **বিকরণভাবঃ**=শরীর বিনাই বিষয় অনুভব করার শক্তি ; চ=এবং ; **প্রধানজয়ঃ**=প্রকৃতির উপর অধিকার—এই তিনটি সিদ্ধির প্রাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা—এই তিনটি সিদ্ধির ভিন্ন-ভিন্ন স্বরূপ হল—

(১) মনোজবিত্ব—মনোজবিত্ব অর্থাৎ মনের সদৃশ গতি। মন যেমন বিনা বাধায় সর্বত্র গমনাগমন করতে পারে তেমনি ইন্দ্রিয়-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থূল শরীরও তৎক্ষণাৎ দূরদেশে গমন করার শক্তি লাভ করে। এটি হল গ্রহণ-অবস্থায় সম্পাদিত সংযমের ফল।

(২) বিকরণভাব—স্থূল-শরীর বিনাই দূরদেশে স্থিত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার যে শক্তি তাকে বিকরণভাব বলা হয়। যখন যোগীর মহাবিদেহা ধারণা (যোগ. ৩।৪৩) সিদ্ধ হয়, সেই সময় মন ও ইন্দ্রিয়ে এই শক্তিই কাজ করে। এর দ্বারাই মানুষ দূর দেশে স্থিত পর শরীরকে প্রত্যক্ষ করে তাতে প্রবিষ্ট হয় (যোগ. ৩।৩৮) ; এ হল স্বরূপাবস্থায় সম্পাদিত সংযমের ফল।

(৩) প্রধানজয়—কার্য ও কারণরূপে স্থিত প্রকৃতির সকল ভেদের উপর সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য বিস্তার করা হল 'প্রধানজয়'। এ হল অস্মিতা, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব অবস্থায় সম্পাদিত সংযমের ফল। এই সংযমকেই 'প্রকৃতিজয়' বলা হয় অর্থাৎ প্রকৃতি তাঁদের আজ্ঞা পালন করে।

এই তিন প্রকার সিদ্ধি গ্রহণ-বিষয়ক সমাধি সিদ্ধ হওয়ার পর আপনা থেকেই উপস্থিত হয় ॥ ৪৮ ॥

সম্বন্ধ—*এখন গ্রহীতার ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধির ফলসহ বর্ণনা করা হচ্ছে :*

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজ্ঞাতৃত্বং চ ॥ ৪৯ ॥

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য=বুদ্ধি ও পুরুষ—এই দুইয়ের ভিন্নতা সম্বন্ধে যিনি জ্ঞাত হয়েছেন, সেই সবীজ-সমাধি প্রাপ্ত যোগীর ; **সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বম্**=সমস্ত ভাবের উপর স্বামিভাব ; চ=এবং ; **সর্বজ্ঞাতৃত্বম**=সর্বজ্ঞতার ভাব এসে যায়।

ব্যাখ্যা—গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধির দ্বারা বুদ্ধির রজোগুণ ও তমোগুণ সম্বন্ধীয় সংস্কার সর্বতোভাবে দূর হয়ে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, আর থাকে কেবল পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্যকে অনুভব করার বৃত্তিটুকু—একে বিবেকজ্ঞানও বলা হয় (যোগ. ৩।৫৪, ৪।২৫)। পূর্ব সূত্রে (যোগ. ৩।৩৫) প্রকারান্তরে এই বিষয়টিই এভাবে বলা হয়েছে যে স্বার্থ-প্রতীতিতে সংযম পালন করলে পুরুষের জ্ঞান হয়। গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধির দ্বারা যখন এই স্থিতি আসে তখন যোগী সমস্ত ভাবের উপর স্বামিত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সমস্ত গুণ, যা কার্য আরম্ভ করতে তৎপর এবং যা অনারম্ভ অবস্থায় প্রতীক্ষারত, তারা সকলে সেই যোগীর আজ্ঞা পালনের জন্য সাগ্রহে উপস্থিত হয় তথা যোগী অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ অবস্থার মধ্যে স্থিত সমস্ত গুণ সম্বন্ধে যুগপৎ সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন। সেই যোগী সর্বজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এর পরের অবস্থা হল ধর্মমেঘ-সমাধি (যোগ. ৪।২৯)॥ ৪৯ ॥

সম্বন্ধ—*পূর্বপাদের ৪৭নং সূত্রে বর্ণিত উচ্চ থেকে উচ্চতর সবীজ-সমাধিকে ও ৪৮নং সূত্রে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকেও নির্বীজ-সমাধির বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়েছে ; উপরিউক্ত সিদ্ধি প্রাপ্তির পরও এগুলিতে অনাসক্ত যোগীর নির্বীজ-সমাধিরূপ কৈবল্য (মুক্তি) প্রাপ্তির কথা বলছেন :*

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্॥ ৫০ ॥

তদ্বৈরাগ্যাৎ অপি=সেখানেও (উপরিউক্ত সিদ্ধি) বৈরাগ্য দেখা দিলে ; **দোষবীজক্ষয়ে**=দোষের বীজ নাশপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ; **কৈবল্যম্**=কৈবল্য প্রাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা—গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাধির দ্বারা যখন যোগী উপলব্ধি করেন যে বুদ্ধি ও পুরুষ—দুইই অত্যন্ত ভিন্ন এবং এদের সংযোগ অবিদ্যাকৃত, বাস্তব

নয়—তখন তার সামনে পূর্বসূত্রে বর্ণিত সিদ্ধিযোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ওখানে (সিদ্ধিতে) আটকে না থেকে যে যোগী পুরুষকে সর্বথা অসঙ্গ, নির্বিকার, কূটস্থ, আনন্দময়, চৈতন্যময় বলে জেনেছেন এবং প্রকৃতির সমস্ত গুণ ও তার কার্যকে জড়, দুঃখপ্রদ ও প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল বলে উপলব্ধি করে তার সকল গুণ ও কার্যের প্রতি অত্যন্ত অনাসক্ত হয়ে যান (যোগ. ১।১৬), সেই পরবৈরাগ্যের দ্বারা যখন দোষের (মলিন বুদ্ধি) বীজরূপ অন্তিম বৃত্তিরও সর্বথা নাশ হয় তখন যোগী নির্বীজ সমাধির স্থিতি লাভ করেন। এই অবস্থায় চিত্ত তার বৃত্তি সমূহের সংস্কারসহ আপন কারণে বিলীন হয় এবং যোগী আপন স্বরূপে স্থিত হন (যোগ. ৪।৩৪)। তাৎপর্য হল এই অবস্থায় যোগীর প্রকৃতির গুণের সঙ্গে আত্যন্তিক বিয়োগ হয়। একেই কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি বলা হয়॥ ৫০ ॥

সম্বন্ধ—*যখন সাধক উচ্চ স্তরে যাত্রা করেন তখন তার জীবনে নানাপ্রকার বিঘ্নও উপস্থিত হয়। তখন তাদের থেকে বাঁচার জন্য সাবধান করছেন—*

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ॥ ৫১ ॥

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে=লোকপাল দেবতাগণ আহ্বান (বা নিমন্ত্রণ) করলে ; **সঙ্গস্ময়াকরণম্**=না (তাদের ভোগে) সঙ্গ (আসক্তি) করা উচিত, না অভিমান বা অহংকার করা উচিত ; **পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ**=কারণ এসবের দ্বারা পুনঃপতনের সম্ভাবনা থাকে।

ব্যাখ্যা—যখন যোগীর উচ্চ স্থিতি প্রাপ্তি হয় তখন উচ্চস্তরের (স্বর্গের দেবতা) অধিপতিগণ বা সিদ্ধিপ্রাপ্তগণের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। সেইসময় দেবতাগণ তাদের নিজ নিজ লোকের নানারকম সুখ ভোগ করার জন্য প্রলোভন দেখান, ভোগের গুণগান করেন এবং তা ভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তখন সাধককে অত্যন্ত সাবধানে থেকে সমস্ত প্রলোভনকে জয় করতে হয়। নিজ মনকে তখন বার বার শুনাতে হয় যে জন্ম-জন্মান্তর ধরে কর্মের ফল ভোগ করতে করতে এই মনুষ্য শরীরে অত্যন্ত

সৌভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরের এবং মহাপুরুষের দয়ায় যে স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছি, তার কাছে জগতের যাবতীয় ভোগই ক্ষণভঙ্গুর, তুচ্ছ। অতএব কেন আমি ওই প্রলোভনের পথে পা বাড়িয়ে সংসার সমুদ্রে ডুবে মরি ? সুখহীন জগতের যাবতীয় সার বস্তু তো ভালোভাবে জানা হয়ে গেছে—মনকে ক্রমাগত এই পাঠ পড়াতে থাকলে মন আসক্তিশূন্য হয়ে যায়। এইভাবেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আনতে হবে, সংসারের প্রতি চিত্তের বিন্দুমাত্র আসক্তিযুক্ত সম্বন্ধ রাখা চলবে না। এছাড়াও মনে বিন্দুমাত্র অহংকারও আনবে না যে আমি কত উচ্চস্থিতি প্রাপ্ত হয়েছি যার জন্য উচ্চস্তরের দেবতাগণ আমাকে সম্মান দিচ্ছেন, নিজ নিজ লোকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। কারণ সঙ্গ (আসক্তি) ও অহংকার—দুটোই সাধককে পুনরায় সংসারচক্রে আবর্তিত হওয়ার অবস্থায় এনে দেয়। সেইজন্য সাধককে প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি বিঘ্ন সম্বন্ধে প্রচণ্ড সচেতন থাকতে হয় ॥ ৫১ ॥

সম্বন্ধ—বিবেকজ্ঞান লাভের অন্য উপায় জানাচ্ছেন—

ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্॥ ৫২ ॥

ক্ষণতৎক্রময়োঃ=ক্ষণ ও তার ক্রমের উপর ; **সংযমাৎ**=সংযম পালন করলে ; **বিবেকজম্**=বিবেকজনিত ; **জ্ঞানম্**=জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—কালের যে ক্ষুদ্রতম বিভাগ আছে, যার থেকে আর ক্ষুদ্র বিভাগ হতে পারে না, তাকে 'ক্ষণ' বলা হয়। ক্ষণ কখনো স্থির থাকে না। এই যে নিরন্তর এক ক্ষণ ধ্বংস হয়ে অন্য ক্ষণের আবির্ভাব তাকে 'ক্রম' বলা হয়। তাৎপর্য হল দুটি ক্ষণ কখনো একসাথে থাকে না এবং দুটি ক্ষণের মধ্যে কোনো ব্যবধানও নেই। একের পিছনে দ্বিতীয় ক্ষণের অনুবর্তন ক্রমাগত চলতে থাকে। একেই 'ক্রম' বলা হয়। এই ক্ষণ ও তার ক্রমে সংযম পালন করলে বিবেকজন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়॥ ৫২ ॥

সম্বন্ধ—সেই বিবেকজ্ঞানের লক্ষণ বলছেন :

জাতিলক্ষণদেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ॥ ৫৩ ॥

জাতিলক্ষণদেশৈঃ=(যে সব বস্তুর) জাতি, লক্ষণ ও দেশ ভেদের দ্বারা ; **অন্যতানবচ্ছেদাৎ**=পার্থক্য করা যায় না, সেইজন্য ; **তুল্যয়োঃ**=যে দুই বস্তু তুল্য (পরস্পরের সদৃশ) বলে মনে হয় তাদের মধ্যে বিদ্যমান ভেদের ; **প্রতিপত্তিঃ**=উপলব্ধি ; **ততঃ**=তার (বিবেকজ্ঞানের) দ্বারা উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—বস্তুর বিষয়ে বিবেচনা করে তাদের পার্থক্য অনুভব করার তিনটি উপায় আছে। (১) বস্তুর জাতি, (২) বস্তুর লক্ষণ অর্থাৎ বর্ণ, আকৃতি ইত্যাদি, (৩) বস্তুর দেশ অর্থাৎ স্থান—এই তিনের দ্বারা বস্তুর ভিন্নতা অনুভব করা যায়। অনেক সময় এই তিনটি কারণের দ্বারাও একইরূপে পরিলক্ষিত দুটি বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বা ভিন্নতা উপলব্ধি করা যায় না কিন্তু ক্ষণক্রমসংযমজাত বিবেকজ্ঞানের দ্বারা একজাতীয় বলে প্রতীত হওয়া বস্তুর মধ্যে পার্থক্যও সাধকের উপলব্ধ হয়॥ ৫৩ ॥

সম্বন্ধ—*সেই বিবেকজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছেন :*

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়মক্রমং চেতি
বিবেকজং জ্ঞানম্॥ ৫৪ ॥

তারকম্=সংসার-সমুদ্র হতে যা তারণ করে ; **সর্ববিষয়ম্**=সকলের সম্পর্কে জ্ঞানযুক্ত ; **সর্বথাবিষয়ম্**=সর্বপ্রকারের জ্ঞানযুক্ত ; **চ**=এবং ; **অক্রমম্**=ক্রমহীন অর্থাৎ পূর্বাপরের ভেদশূন্য ; **ইতি**=এইরূপ হল ; **বিবেকজম্**= বিবেকজনিত ; **জ্ঞানম্**=জ্ঞান।

ব্যাখ্যা—এই জ্ঞান পরবৈরাগ্য উৎপন্ন করে যোগীকে কৈবল্য অবস্থায় উপনীত করার হেতু। সেইজন্য একে 'তারক' অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হতে উদ্ধারকারী (মুক্তিদায়ক) বলা হয়। এই 'তারক' জ্ঞানের সহায়ে যোগী সর্ববস্তুকে সর্বপ্রকারে জানতে পারেন—সেজন্য এটি 'সর্ববিষয়ম্' ও 'সর্বথাবিষয়ম্'। তখন যোগী প্রত্যেক বস্তুকে ক্রমহীনভাবে একইসঙ্গে জানতে পারেন—সেইজন্য একে 'অক্রমম্'ও বলা হয়। এ হল জ্ঞানের অন্তিম অবস্থা—এর থেকে জ্ঞানের উচ্চ স্থিতি আর নেই। 'অক্রমম্' বলতে এমনও বুঝতে হবে যে, যা অপরিবর্তনীয় বা ক্রমরহিত অর্থাৎ অন্যান্য

জ্ঞানের মতো যে জ্ঞান পরিবর্তনশীল নয়। প্রথম পাদের ১৬নং সূত্রে এই জ্ঞানকেই পরবৈরাগ্যের হেতু বলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে এই জ্ঞানকে 'পুরুষখ্যাতি' নামে অভিহিত করা হয়েছে॥ ৫৪ ॥

সম্বন্ধ—*উপরিউক্ত প্রকারে বিবেকজ্ঞান লাভ হলেই যে কৈবল্য প্রাপ্তি হবে, তার কোনো নিয়ম নেই। এছাড়া অন্য উপায়েও বিবেকজ্ঞান লাভ হয়ে কৈবল্যপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। অতএব কৈবল্য প্রাপ্তির জন্য যার উপস্থাপনা অত্যন্ত আবশ্যক তার বর্ণনা করা হচ্ছে :*

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্॥ ৫৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃ=বুদ্ধি ও পুরুষ—এই দুজনের ; **শুদ্ধিসাম্যে**=যখন সমানভাবে শুদ্ধি হয়ে যায়, তখন ; **কৈবল্যম্**=কৈবল্য প্রাপ্তি হয়।

ব্যাখ্যা—একদিকে বুদ্ধিতত্ত্ব অত্যন্ত নির্মল হয়ে নিজ কারণে বিলীন হয়, অন্যদিকে পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধির যে অজ্ঞানকৃত সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত মল-বিক্ষেপ-আবরণ—তা সর্বথা লোপ হলে নিত্যশুদ্ধ পুরুষের পূর্ণপ্রকাশ হয়। এইভাবে যখন সত্ত্ব (অর্থাৎ বুদ্ধি) সমানভাবে পুরুষের মতোই শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তা যে কোনো নিমিত্ত বা কারণবশে এবং যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন, তখন কৈবল্যলাভ হয়॥ ৫৫ ॥



।। ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ ।।

কৈবল্যপাদ—৪

প্রথম পাদে প্রধানত সমাধির স্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। সেইজন্য তাকে 'সমাধিপাদ' বলা হয়। দ্বিতীয়পাদে সমাধির সাধনের বর্ণনা আছে। সেইজন্য তাকে 'সাধনপাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তৃতীয়পাদে সমাধি দ্বারা প্রাপ্ত নানাপ্রকার সিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব তাকে 'বিভূতিপাদ' বলা হয়েছে। এই তিনটি পাদে প্রসঙ্গানুসারে সমাধির প্রকৃত অভীষ্ট ফলের (কৈবল্য) বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে সেটির বিবেচনা করা হয়নি। সুতরাং কৈবল্য প্রাপ্তির বিস্তারিত বর্ণনা করার জন্য এই চতুর্থ পাদ আরম্ভ করা হল। সেইজন্য এর নাম 'কৈবল্যপাদ'।

সম্বন্ধ—*তৃতীয়পাদে যে নানাপ্রকার সিদ্ধির বর্ণনা করা হয়েছে তা কেবল সমাধির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, অন্য কোনো ভাবে নয়। অতএব সেটির আলোচনা করা হচ্ছে :*

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ।। ১ ।।

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ=জন্মের দ্বারা, ওষধি-বিশেষের দ্বারা, মন্ত্র জপের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, সমাধির দ্বারা (এই পাঁচ প্রকার) ; **সিদ্ধয়ঃ**= সিদ্ধিসকল সঞ্জাত হয়।

ব্যাখ্যা—শরীর, ইন্দ্রিয় ও চিত্তে পরিবর্তন হলে পূর্বের অপেক্ষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন যে অপার্থিব শক্তির আবির্ভাব হয় তাকে সিদ্ধি বলা হয়। এই সমস্ত সিদ্ধির মূলে পাঁচটি কারণ আছে। তা হল—

১) জন্মগত সিদ্ধি—মৃত্যুর পর জীব যখন এক যোনি থেকে অন্য যোনিতে গমন করে, তখন প্রারব্ধানুসারে তার শরীর, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের পরিবর্তন হয়ে সেখানে এক অভূতপূর্ব শক্তির আবির্ভাব হয় (যোগ.

১।১৯)। যেমন, মনুষ্যযোনি হতে দেবযোনি প্রাপ্ত হলে শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তে অদ্ভুত শক্তি দেখা দেয়, এটিকে 'জন্মজা' সিদ্ধি বলা হয়। কপিল, বেদব্যাস, শুকদেব প্রমুখ মহর্ষির মধ্যে এই 'জন্মজা' যোগসিদ্ধির বর্ণনা ইতিহাস-পুরাণে দেখা যায়।

২) ওষধিবিশেষের দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধি—সাধক যখন কোনো বিশেষ ধরনের ওষধি সেবন করে বিশেষ কায়কল্পাদি সাধন করেন তখন তাঁর শরীরেও এক বিশেষ ধরনের শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। একে 'ওষধিজা' সিদ্ধি বলা হয়। ওষধি (ভৌতিক পদার্থ) দ্বারা চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ে এক অদ্ভুত শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। ওষধির দ্বারা যে কেবল মানুষের শরীরের পরিবর্তন হয় তা নয়—বৃক্ষ, লতা, পশুপক্ষী প্রভৃতির শরীরেও অসাধারণ শক্তির প্রাদুর্ভাব হতে পারে, তথা নানাপ্রকার ভৌতিক বিকাশ সম্ভব।

৩) মন্ত্রদ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধি—যোগী যখন এক বিশেষ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে বিধিবৎ কোনো মন্ত্রের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর শরীরে-ইন্দ্রিয়ে-চিত্তে অনন্য শক্তির আবির্ভাব হয়। একে 'মন্ত্রজা' সিদ্ধি বলা হয় (যোগ. ২।৪৪)। বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪) তপঃ প্রভাবে প্রাপ্ত সিদ্ধি—যখন সাধক শাস্ত্রোক্ত তপের বিধিবৎ অনুষ্ঠান করেন অথবা নিজের কর্তব্য পালন করার জন্য অত্যন্ত কঠিন কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেন, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেন না—তখন সেই তপশ্চর্যার দ্বারা তাঁর শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তে স্থিত যাবতীয় দোষ নাশ হয়ে তাঁর শরীরে এক অলৌকিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। একে 'তপোজা' সিদ্ধি বলা হয় (যোগ.২।৪৩)। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র প্রমুখ ঋষি তপঃ প্রভাবে জাত সিদ্ধির প্রয়োগ দেখিয়ে গিয়েছেন।

৫) সমাধি দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধি—ধারণা-ধ্যান-সমাধির অভ্যাসের দ্বারা শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তে এক অত্যাশ্চর্য শক্তি আবির্ভূত হয়। একে 'সমাধিজা' সিদ্ধি বলা হয়। তৃতীয় পাদে স্বয়ং সূত্রকার এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

উপরিউক্ত সিদ্ধিপ্রাপ্তির দ্বারা শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তে যে অনন্যসাধারণ পরিবর্তন হয় অর্থাৎ একরকম থেকে অন্যরকম হওয়া—তা হল পরিণামান্তর। সেইজন্য একে 'জাতি-অন্তর-পরিণাম' বলা হয়॥ ১ ॥

সম্বন্ধ—*উক্ত 'জাত্যন্তরপরিণাম' কীভাবে ঘটে—এখন সেটির বর্ণনা করছেন—*

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ॥ ২ ॥

জাত্যন্তরপরিণামঃ=(এই) এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে পরিবর্তন হল জাত্যন্তর-পরিণাম ; **প্রকৃত্যাপূরাৎ**=প্রকৃতির পূর্ণতার দ্বারা সম্ভব হয়।

ব্যাখ্যা—উক্ত 'জাতি-অন্তর-পরিণাম'-রূপ পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ সেই বিশেষ শক্তিকে প্রকট করার জন্য যে-যে প্রকৃতি অর্থাৎ তৎ-সম্বন্ধীয় যে-সকল উপাদান-কারণরূপ তত্ত্বের প্রয়োজন হয়, সেগুলি লাভ হলে শরীর ইন্দ্রিয় ও চিত্তের এক জাতি হতে অন্য জাতিতে পরিবর্তন সম্ভব হয় অর্থাৎ তীব্র যোগ প্রভাবে যোগী মনুষ্য থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হন॥ ২ ॥

সম্বন্ধ—*এখানে প্রশ্ন জাগে যে জন্ম, ওষধি ইত্যাদি নিমিত্ত কারণ কেমন করে প্রকৃতিকে পূর্ণতা দেয়, তাহলে কি এরাই প্রকৃতিকে চালায় ? এ বিষয়ে বলছেন—*

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু
ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ॥ ৩ ॥

নিমিত্তম্=নিমিত্ত ; **প্রকৃতীনাম্**=প্রকৃতিসমূহকে ; **অপ্রয়োজকম্**=চালায় না ; **ততঃ**=তার দ্বারা ; **তু**=তো (কেবল) ; **ক্ষেত্রিকবৎ**=কৃষকের মতো ; **বরণভেদঃ**=বাধাগুলো অপসারণ করা হয়।

ব্যাখ্যা—পূর্বে যে জন্ম ওষধি ইত্যাদি নিমিত্ত কারণের কথা বলা হয়েছে, তা প্রকৃতিকে চালায় না বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়েও যায় না। তার কাজ কেবল বাধার অপসারণ করা। তারপর প্রকৃতির পূরণ তো নিজে থেকেই হয়ে যায়। যেমন, কৃষক যখন এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে জল নিয়ে যায় তখন জল যাওয়ার পথের বাধাটা সেই কৃষক দূর করে দেয়। জলের চলার অর্থাৎ তাকে অগ্রসর করার কাজটা সে (কৃষক) করে না। বাধা

দূর হলে জল নিজে থেকেই এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে চলে যায়। তেমনই জন্ম আদি নিমিত্ত দ্বারা যখন বাধা দূর হয়ে যায়, তখন শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তের পরিবর্তনের জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন হয় তাদের পূরণ নিজে থেকেই হয়ে যায়। বাধা দূর হলে স্বল্পতা বা অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করা হল প্রকৃতির স্বভাব॥ ৩ ॥

নির্মাণচিত্তান্যস্মিতামাত্রাৎ॥ ৪ ॥

নির্মাণচিত্তানি=সৃষ্ট চিত্তসমূহ ; **অস্মিতামাত্রাৎ**=কেবল অস্মিতার দ্বারা সম্ভব হয়।

ব্যাখ্যা—চিত্তের উপাদান কারণ হল অস্মিতা। সেইজন্য কেবল অস্মিতা বা অহং-তত্ত্ব থেকেই নির্মিত এই সকল চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে॥ ৪ ॥

প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্॥ ৫ ॥

অনেকেষাম=(স্বেচ্ছানির্মিত সেই সব) বহুচিত্তকে ; **প্রবৃত্তিভেদে**=নানা ধরনের প্রবৃত্তিতে ; **প্রয়োজকম্**=নিয়োগকর্তাও ; **একম্**=একটি (মাত্র) ; **চিত্তম্**=চিত্ত (সহজাত বা স্বাভাবিক চিত্ত)।

ব্যাখ্যা—নিজ শরীরে স্থিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করার জন্য যেমন একটিই সহজাত চিত্ত থাকে, তেমনি অস্মিতা বা অহং তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্ট বহু চিত্তের চালনাকারী যোগীরও ওই সহজাত চিত্ত একই হয়ে থাকে। যোগীর ইচ্ছাসৃষ্ট নতুন চিত্ত যোগীর সহজাত চিত্তের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে[১]॥ ৫ ॥

---

[১]ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্রের যে অর্থ জানিয়েছেন তদনুসারে ষষ্ঠ সূত্রের অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না। সেইজন্য টীকাকারগণ ষষ্ঠ সূত্রের সম্বন্ধ প্রথম সূত্রের সঙ্গে আছে বলে মনে করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্রে যে বহুচিত্ত নির্মাণের কথা বলা হয়েছে সেটিও এস্থলে প্রসঙ্গানুকূল নয়। অতএব সূত্রকারের প্রকৃত তাৎপর্য কী—সেটি বিবেচনার যোগ্য। এখানে শুধুমাত্র সূত্রের অনুবাদ দেওয়া হল।

সম্বন্ধ——*প্রথম সূত্রে বর্ণিত পাঁচ প্রকারে সিদ্ধ চিত্ত সমূহের মধ্যে সমাধি দ্বারা সিদ্ধ চিত্তের বিশেষত্ব বর্ণনা করছেন :*

তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্॥ ৬ ॥

তত্র=তার মধ্যে ; **ধ্যানজম্**=ধ্যানজনিত চিত্ত ; **অনাশয়ম্**=কর্ম-সংস্কার-রহিত হয়।

ব্যাখ্যা——জন্ম-ওষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধি——এই পাঁচটি কারণের দ্বারা শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তে বিশেষ-বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দেয়। তথাপি সমাধিসিদ্ধ যোগীর চিত্তই কেবল কৈবল্য লাভের উপযুক্ত হয়। সমাধিসিদ্ধ চিত্তে কর্মের বীজ থাকে না। কিন্তু অন্যান্য চিত্তে অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ, ওষধিসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ অথবা তপঃসিদ্ধ যোগীর চিত্তে কর্ম-সংস্কার থেকে যায়। অর্থাৎ ওই সকলের দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধিতে কৈবল্য প্রাপ্তি হতে পারে না॥ ৬ ॥

সম্বন্ধ——*এখন কর্মাশয়শূন্য সিদ্ধ যোগীর কর্মের বিশেষত্ব প্রতিপাদন করছেন*——

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্॥ ৭ ॥

যোগিনঃ=যোগীর ; **কর্ম**=কর্ম ; **অশুক্লাকৃষ্ণম্**=অশুক্ল ও অকৃষ্ণ হয় (তথা) ; **ইতরেষাম্**=অন্যান্যদের (কর্ম) ; **ত্রিবিধম্**=তিন প্রকারের হয়।

ব্যাখ্যা——যে সমস্ত কর্মের ফল সুখদায়ী হয় তাকে শুক্লকর্ম বলা হয়, আর যে সমস্ত কর্মের ফল নরক ইত্যাদি দুঃখভোগের কারণ হয় তাকে কৃষ্ণকর্ম বলা হয় অর্থাৎ পুণ্যকর্মের নাম শুক্লকর্ম আর পাপকর্মের নাম কৃষ্ণকর্ম। সিদ্ধ যোগীর কর্ম কোনোরকম ভোগ প্রদান করে না। কারণ তাঁর বাসনাশূন্য চিত্ত কর্মসংস্কার শূন্য হয়ে যায়। এই কর্ম হল অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ। যোগী ছাড়া সাধারণ মানুষের দ্বারা তিন প্রকার কর্ম সাধিত হয়——১) শুক্ল অর্থাৎ পুণ্যকর্ম, ২) কৃষ্ণ অর্থাৎ পাপকর্ম এবং ৩) শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্ম॥ ৭ ॥

সম্বন্ধ——*এবার সাধারণ মানুষের ওই তিন প্রকার কর্মের ভোগ কীভাবে হয় তা বলছেন*——

ততস্তদ্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্॥ ৮ ॥

ততঃ=এর (তিন প্রকার কর্ম) দ্বারা ; **তদ্বিপাকানুগুণানাম্**=তাদের (কৃতকর্মের) ফলভোগের অনুকূল ; **বাসনানাম্**=বাসনাসমূহের ; **এব**=ই ; **অভিব্যক্তিঃ**= অভিব্যক্তি (উৎপত্তি) হয়।

ব্যাখ্যা—সাধারণ মানুষের কর্ম জন্মজন্মান্তর ধরে সংস্কাররূপে অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে, কারণ তাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়নি। সেই অসংখ্য সঞ্চিত কর্মের মধ্যে যে কর্মের ফলভোগ করার সময় উপস্থিত হয়, সেই সময়ে সেই কর্মের যেমন ফল হওয়া উচিত ঠিক সেই ধরনের বাসনা উৎপন্ন হবে। অবশিষ্ট বাসনাগুলো সুপ্ত অবস্থায় থাকবে অর্থাৎ অন্যান্য কর্মগুলো কর্মফল ভোগ করানোর জন্য তখনও পরিপক্কতা লাভ করেনি॥ ৮ ॥

সম্বন্ধ—*কর্মসংস্কার জন্মজন্মান্তর ধরে চলে, সেখানে দেশ, কাল ও জন্মজন্মান্তরের ব্যবধান থাকে। এই স্থিতিতে বর্তমান জন্মের অনুরূপ ফলভোগ বাসনা কেমন করে উৎপন্ন হয়, তা বলছেন :*

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়ো-রেকরূপত্বাৎ॥ ৯ ॥

জাতিদেশকালব্যবহিতানাম্=জাতি-দেশ-কাল এই তিনের ব্যবধান ; **অপি**=সত্ত্বেও ; **আনন্তর্যম্**=কর্মের সংস্কারে ব্যবধান থাকে না ; **স্মৃতিসংস্কারয়োঃ**=কারণ স্মৃতি ও সংস্কার (বাসনা) দুটিই ; **একরূপত্বাৎ**=স্বরূপতঃ এক।

ব্যাখ্যা—ভিন্ন-ভিন্ন জন্মে ভিন্ন-ভিন্ন কর্ম সাধিত হয়। অতএব দুটি কর্ম করার মধ্যে জন্মের ব্যবধান থেকে যায়। এইভাবে ভিন্ন-ভিন্ন কর্মের মধ্যে দেশ ও কালের ব্যবধান থাকে। জন্ম-দেশ-কালের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও যে কর্ম তার ফল দানের জন্য তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ যে কর্মফলের উৎপাদক নিমিত্তকারণ উপস্থিত হয়েছে, সেই অনুসারে ভোগবাসনা উৎপন্ন হবে এবং সেখানে কোনো প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি হবে না। কারণ স্মৃতি ও সংস্কার পৃথক নয়, একই বস্তু। যেমন, পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী যদি গাভী

যোনি প্রাপ্ত হওয়ার থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী বাসনাও প্রকট হয়। তাৎপর্য এই যে, সেই জন্মের পর হয়তো অনেক জন্ম পার হয়ে গেছে, অনেক সময় পার হয়ে গেছে, কোনো এক দেশে (স্থানে) ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু জন্মান্তর, কালান্তর ও দেশান্তরের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও বাসনা লুপ্ত হয় না, বরং অনুকূলকালে তা স্ফুরিত হয়। স্মৃতি ও সংস্কার—দুটোই এক হওয়ার জন্য যে ফল লাভ হয়, তার অনুকূল ভোগবাসনা অর্থাৎ স্মৃতিও তৈরি হয়॥ ৯ ॥

সম্বন্ধ——*এই আলোচনার ফলে এই শঙ্কা দেখা দেয় যে যখন বাসনা অনুসারে জন্ম লাভ হয় এবং কর্ম অনুসারে বাসনা তৈরি হয় তাহলে জীবের জন্মের কারণরূপ সর্বপ্রথম বাসনা কোথা থেকে জেগেছিল ? তার উত্তরে বলছেন—*

তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ॥ ১০ ॥

তাসাম্=ওই সমস্ত বাসনার ; **অনাদিত্বম্**=অনাদিত্ব রয়েছে ; **আশিষঃ নিত্যত্বাৎ চ**=কারণ জীবের বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিত্য অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে বর্তমান।

ব্যাখ্যা—প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল এবং নিত্য বর্তমান, জীব মরতে চায় না। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর প্রাণীর মধ্যেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা বর্তমান, তাদের মধ্যেও মৃত্যুভয় দেখা যায়। এর দ্বারা পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয়, কারণ পূর্ব-পূর্ব জন্মেও জীব অবশ্যই মৃত্যুকালে অসহনীয় যাতনা অনুভব করেছিল। জন্মজন্মান্তরেও সেই স্মৃতি তাকে অস্থির করে তোলে, সে মরতে ভয় পায়। অতএব বাসনার অনাদিত্ব স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধ হয়॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ——*এই ভাবে বাসনা যদি অনাদি হয়, তবে তার অভাবও কখনো হবে না, তাহলে পুরুষের মুক্তি কেমন করে হবে ? এর উত্তরে জানাচ্ছেন—*

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ॥ ১১ ॥

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ=হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন—এদের দ্বারা ; **সংগৃহীতত্বাৎ**=বাসনা সঞ্চিত হয়, সেইজন্য ; **এষাম্**=এদের (এই চারের) ; **অভাবে**=অভাব হলে ; **তদভাবঃ**=ওদেরও (সমস্ত বাসনার সর্বথা) অভাব হয়।

ব্যাখ্যা—বাসনার হেতু বা কারণ হল অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্লেশ ও তজ্জনিত কর্ম। আর তার ফল হল পুনর্জন্ম, আয়ু ও ভোগ। আশ্রয় হল চিত্ত এবং শব্দ ইত্যাদি বিষয় হল আলম্বন (অবলম্বন)। এদের সহায়তায় বাসনা সংগৃহীত বা সঞ্চিত হয়। কিন্তু যোগসাধনার দ্বারা বাসনার বিনাশ হয় অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানের দ্বারা যখন অবিদ্যার নাশ হয় (যোগ. ৪।৩০), তখন কর্মের আর ফল দেবার সামর্থ্য থাকে না, চিত্ত নিজ কারণে বিলীন হয়ে যায় (যোগ. ৪।৩৪)। অতএব হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন—এই চারের চক্র হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যোগী যখন যোগকৌশল অবলম্বন করে ওই চক্রের গতি ভঙ্গ করে দেন তখন তিনি আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। তিনি সংসার চক্রের আবর্তন হতে পরিত্রাণ লাভ করেন॥ ১১ ॥

সম্বন্ধ—*যদি সৎ বস্তুর কখনো অভাব নাই হয় তাহলে বাসনা ও তার হেতু ইত্যাদির নাশ কীভাবে সম্ভব ? তার উত্তরে বলছেন :*

অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্ত্যধ্বভেদাদ্ধর্মাণাম্॥ ১২ ॥

ধর্মাণাম্=ধর্মসমূহে ; **অধ্বভেদাৎ**=কালের ভেদ হয়, সেইজন্য ; **অতীতানাগতম্**= যে ধর্ম (অবিদ্যা, বাসনা, চিত্ত ও চিত্তের বৃত্তিসমূহ ইত্যাদি) অতীত হয়ে গেছে এবং যা অনাগত—এখনও প্রকট হয়নি, তাও ; **স্বরূপতোঽস্তি**=স্বরূপতঃ সব কালেই বিদ্যমান থাকে।

ব্যাখ্যা—বাস্তবে বস্তুর কখনো নাশ হয় না। বস্তুর ধর্ম অনুসারে চিত্ত-বাসনা ইত্যাদি কখনো অনাগত স্থিতিতে থাকে, কখনো বর্তমান স্থিতিতে থাকে, কখনো অতীত স্থিতিতে থাকে। মনে রাখতে হবে যে, যা বর্তমানে আছে কেবল তারই সত্তা আছে, অন্যগুলির নেই—তা নয়। কারণ স্বরূপে তা সকল কালেই বিদ্যমান আছে। বর্তমানে ব্যক্ত বা প্রকট না থাকলেও অতীত ও অনাগত অবস্থাতেও তা আপন কারণে অদৃশ্যরূপে সুপ্ত থাকে।

এইভাবে নিজ কারণে বিলীন হয়ে যাওয়াই হল তার নাশ হওয়া বা অতীত হয়ে যাওয়া (যোগ. ৩।১৩)। কেবল যোগীর ওই বাসনার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। সেইজন্য তা যোগীর পুনর্জন্মের হেতুও হতে পারে না॥ ১২ ॥

সম্বন্ধ—*ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী ? এর উত্তরে বলছেন :*

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

তে=তারা (সমস্ত ধর্ম) ; **ব্যক্তসূক্ষ্মাঃ**=ব্যক্ত স্থিতিতে এবং সূক্ষ্ম স্থিতিতে (সর্বদাই) ; **গুণাত্মানঃ**=হল গুণস্বরূপ।

ব্যাখ্যা—ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ হল বর্তমানে বিদ্যমান থাকলেও তা নিজ কারণরূপ গুণ হতে কখনো ভিন্ন নয়, আবার যখন তারা অনাগত ও অতীত—এই দুই সূক্ষ্ম স্থিতিতে থাকে তখনও গুণস্বরূপই থাকে। প্রকৃতপক্ষে গুণ ওইসব ধর্মরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে ধর্মরূপে (কারণ) সর্বদাই অনুগত থাকে, কখনোই তার অভাব হয় না, এইজন্য কোনো বস্তুরই সত্তার অভাব হয় না। সেইজন্য ব্যক্ত হোক বা সূক্ষ্ম—সমস্ত বস্তুই গুণময় (সত্ত্ব-রজ-তম)-রূপে সর্বদাই বর্তমান থাকে। এই তিন গুণই পরিণামী এবং সেইজন্য তা নিরন্তর পরিবর্তনশীলও॥ ১৩ ॥

সম্বন্ধ—*যদি গুণের কার্য হওয়ার জন্য বাস্তবে সবকিছু গুণময়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবসম্পন্ন তিন গুণ হতে এক-একটি বস্তুর উৎপত্তি কেমন করে হয় ? প্রত্যেকের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হওয়া উচিত ছিল ? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—*

পরিণামৈকত্বাদ্বস্তুতত্ত্বম্॥ ১৪ ॥

পরিণামৈকত্বাৎ=পরিণামের একতার জন্য ; **বস্তুতত্ত্বম্**=বস্তুর সেইরকম হওয়া সম্ভব হয়।

ব্যাখ্যা—ভিন্ন-ভিন্নস্বভাবসম্পন্ন গুণের পরিণামের মধ্যে ঐক্য থাকতে পারে। সেইজন্য সমস্ত কিছু মিলেমিশে যখন এক বস্তুতে পরিণত হয়, তখন কোনো বিরোধ দেখা যায় না। ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর পরিণাম এক হওয়ায় একটি

বস্তুর প্রকট হওয়া প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, পৃথিবী ও জল মিলে সূর্য ও চন্দ্রমার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং তারপর সেখানে আবার নানা জাতি, নানা আকার, নানা ব্যক্তিত্বের ভেদ দেখা যায়। কিন্তু বস্তু তো নিজ ধর্মী থেকে সর্বথা অভিন্ন। এইভাবে সমস্ত বস্তুই গুণস্বরূপ, তা থেকে ভিন্ন নয়॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ——*যাঁরা মনে করেন যে কোনো বাহ্য বস্তু দৃশ্য নেই, বাসনার বলে চিত্তই দৃশ্যরূপে প্রতীত হয়, তাঁদের এই মনে করাটা ভুল। কারণ :*

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ॥ ১৫ ॥

বস্তুসাম্যে=বস্তুর একতার মধ্যেও ; **চিত্তভেদাৎ**=চিত্তের ভেদ প্রত্যক্ষ হয়, সেইজন্য ; **তয়োঃ**=(চিত্ত ও তার দ্বারা দৃশ্যমান বস্তু) এই দুইয়ের ; **পন্থাঃ**=পথ ; **বিভক্তঃ**=পৃথক।

ব্যাখ্যা—বস্তু এক হলেও মানুষের চিত্তবৃত্তি বিভিন্ন। সেইজন্য একই বস্তু ভিন্ন-ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। এই পরিস্থিতিতে যদি বস্তু কোনো একটি চিত্তের কল্পনামাত্র বলে মনে করা হয় তাহলে তা অনেক চিত্তের বিষয় হতে পারে না। অতএব সকলের কাছে তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ না হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু তাও হয় না—তা প্রত্যেকেই দেখতে পায়। এছাড়া যদি তাকে (বস্তুকে) অনেক চিত্তের কল্পনা বলে মনে করা হয়, তাহলে তাও ঠিক নয়। কারণ সেই একই বস্তু ভিন্ন-ভিন্ন কালে অনেক চিত্তের বিষয় হতে দেখা যায় অর্থাৎ একই নারী কখনো জননী, কখনো জায়া। এই পরিস্থিতিতে তাকে কোন চিত্তের কল্পনা বলে মানা হবে ? অতএব বস্তুর একত্ব এবং চিত্তের বহুত্বের জন্য ওই একই বস্তু বহুরূপে প্রতীত হয়, ফলে চিত্ত এবং বস্তু পৃথক পৃথক পদার্থ—এটি মনে করাই যুক্তিযুক্ত॥ ১৫ ॥

সম্বন্ধ——*পুনরায় পূর্বপক্ষের খণ্ডন করার জন্য অন্য সূত্রের উল্লেখ করছেন :*

ন চৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং স্যাৎ॥ ১৬ ॥

চ=এছাড়া ; **বস্তু**=দৃশ্য বস্তু ; **একচিত্ততন্ত্রম্**=কোনো একটি চিত্তের

অধীন ; **ন**=নয় (কেননা) ; **তদপ্রমাণকম্**=যখন তা সেই চিত্তের বিষয় হয় না ; **তদা**=সেই সময় ; **কিং স্যাৎ**=বস্তুর কী হবে ?

ব্যাখ্যা—এছাড়া দৃশ্যমান বস্তু কোনো একটি চিত্তের অধীন নয়, অতএব তা কল্পনামাত্রও নয়। যদি কল্পনামাত্র বলে মানা হয় তাহলে যখন সেই চিত্ত তাকে (বস্তুকে) বিষয় করে না বা দেখে না তখন তার (বস্তুর) থাকা উচিত নয়। কিন্তু তা হয় না, বস্তু যেমনকার তেমনই বিদ্যমান থাকে। এতে সিদ্ধ হয় যে দৃশ্যমান বস্তু কোনো একটি চিত্তের অধীন নয় তথা দৃষ্ট বস্তু চিত্ত হতে ভিন্ন এবং তা সত্য॥ ১৬ ॥

সম্বন্ধ—*যদি বাহ্য দৃষ্ট বস্তু নিজ স্বতন্ত্র সত্তা রাখে তাহলে তা কখনো দেখা যায়, কখনো দেখা যায় না—এর কারণ হিসাবে বলা হয় :*

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাচ্চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্॥ ১৭ ॥

চিত্তস্য=চিত্তের ; **তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ**=বস্তুর উপরাগের (নিজের মধ্যে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ার) অপেক্ষা থাকে, সেইজন্য ; **বস্তু**=বস্তু ; **জ্ঞাতাজ্ঞাতম্**= কখনো জ্ঞাত, কখনো অজ্ঞাত থাকে (অর্থাৎ প্রতিবিম্বকালে জ্ঞাত, অন্য সময়ে অজ্ঞাত থাকে)।

ব্যাখ্যা—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলে চিত্তে যে বস্তুর ছায়া পড়ে, চিত্ত কেবলমাত্র সেই বস্তুকেই জানতে পারে, অন্য বস্তুকে নয়। বস্তুর জ্ঞান জন্মানোর জন্য চিত্তে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ার অপেক্ষা থাকে। চিত্তে যখন সে বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিত্তের সঙ্গে যখন যে বস্তুর সম্বন্ধ হয়, সেই সময় সেই বস্তু জ্ঞাত হয় আর যখন বস্তুটি চিত্তের বৃত্তির বিষয় হয় না অর্থাৎ চিত্তে অঙ্কিত হয় না, সেসময়ে তা অজ্ঞাত থাকে॥ ১৭ ॥

সম্বন্ধ—*এভাবে দৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে চিত্তের ভিন্নতা সিদ্ধ করে এখন দ্রষ্টাপুরুষ থেকেও চিত্তের ভিন্ন সত্তা সিদ্ধ করছেন :*

সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ॥ ১৮ ॥

তৎপ্রভোঃ=তার (চিত্তের) স্বামী ; **পুরুষস্য**=পুরুষ ; **অপরিণামিত্বাৎ**= পরিণামী নয়, সেইজন্য ; **চিত্তবৃত্তয়ঃ**=চিত্তের বৃত্তিগুলি ; **সদা জ্ঞাতাঃ**=

সর্বদাই তাঁর জ্ঞাত থাকে।

ব্যাখ্যা—চিত্ত হল পরিণামী। সেইজন্য তা বাইরের বস্তুকে সবসময় দেখতে পায় না। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন যে বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়, তখন চিত্ত সেই বস্তুকে দেখতে পারে। কিন্তু চিত্তের স্বামী পুরুষ চিত্তকে সর্বদা জানতে পারেন। কারণ তিনি অপরিণামী—চিত্তের জ্ঞাতা, চিত্ত বৃত্তিকে তিনি সর্বদাই দেখতে থাকেন। যে কোনো বৃত্তি চিত্তে উৎপন্ন হোক বা লয়-প্রাপ্ত হোক—নিত্য চৈতন্য প্রভু সবকিছু জানতে পারেন॥ ১৮ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্ত যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক, তেমনি নিজেরও। তাহলে চিত্ত হতে ভিন্ন অন্যকে দ্রষ্টা মানার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলছেন :*

ন তৎস্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ॥ ১৯ ॥

তৎ=তা (চিত্ত) ; **স্বাভাসম্**=স্বয়ংপ্রকাশ (প্রকাশস্বরূপ) ; **ন**=নয় ; **দৃশ্যত্বাৎ**=কারণ তা হল দৃশ্য।

ব্যাখ্যা—চিত্ত হল দৃশ্য, সেইজন্য তা জড়। চিত্ত স্বয়ংপ্রকাশ নয় অর্থাৎ স্বয়ং-কে জানতে পারে না—প্রকাশস্বরূপ নয়। চিত্তে যে চেতনতা দেখা যায়, যার জন্য তাকে কিছু অংশে চেতন বলা হয়ে থাকে, তার প্রকৃত কারণ হল চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব চিত্তের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় চিত্তকে চেতনের ন্যায় মনে হয়। যখন চিত্তে বাহ্যবস্তু এবং চেতন পুরুষ—এই দুইয়ের প্রতিবিম্ব পড়ে, সেই সময় চৈতন্য পুরুষও চিত্তবৃত্তি অনুসারে যেন তদ্রূপ হয়ে যান (যোগ.১।৪) এবং চিত্ত চেতনসদৃশ বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে ইন্দ্রিয়, শব্দ ইত্যাদি বিষয় যেমন দৃশ্য হবার জন্য স্বয়ংপ্রকাশ নয়, তেমনি চিত্তও দৃশ্য হবার জন্য স্বয়ংপ্রকাশ নয়। এদের প্রকৃত প্রকাশক হলেন চৈতন্যস্বরূপ যার অন্য নাম পুরুষ॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্তকে স্বপ্রকাশ মানলে আরেকটি দোষের কথা বলছেন*—

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্॥ ২০ ॥

চ=তথা ; **একসময়ে**=এক কালে ; **উভয়ানবধারণম্**=(চিত্ত ও তার

বিষয়)—এই দুইয়ের স্বরূপকে জানা যায় না।

ব্যাখ্যা—চিত্তে বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে। তখন দ্রষ্টাপুরুষের সেই প্রতিবিম্ব সম্বলিত চিত্তের জ্ঞান হওয়া স্বাভাবিক ; কেননা তিনি (পুরুষ) অপরিণামী। কিন্তু চিত্ত নিজের স্বরূপকে ও বাহ্য বস্তুর স্বরূপকে একসাথে জানতে পারে না। পরিণামশীল হওয়ার জন্য চিত্তের এককালে দুটি জ্ঞান হতে পারে না। সেইজন্য এটাই বুঝে নিতে হবে যে চিত্ত স্বয়ংপ্রকাশ নয়। চিত্তের কাজ কেবল বাহ্যবস্তুর স্বরূপকে আপন স্বামী দ্রষ্টাপুরুষের সামনে রেখে দেওয়া, তারপর তাকে জানার কাজ হল পুরুষের॥ ২০ ॥

সম্বন্ধ—*যদি এটি মানা হয় যে, চিত্তের দ্বারা বিষয়ের সাক্ষাৎকার হয় এবং সেই চিত্তকে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় ভিন্ন চিত্তের দ্বারা দেখা যায় এবং এইভাবে চিত্তের ও বিষয়ের এক সঙ্গে জ্ঞান হয়ে যায়—এরূপ মেনে নিলে ক্ষতি কোথায় ? এ সম্পর্কে বলছেন—*

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ॥ ২১ ॥

চিত্তান্তরদৃশ্যে=এক চিত্তকে অন্য চিত্তের দৃশ্য বলে মেনে নিলে ; **বুদ্ধিবুদ্ধেঃ অতিপ্রসঙ্গঃ**=সেই চিত্ত আবার অন্য চিত্তের দৃশ্য হবে—এই ধরনের অনবস্থা হবে ; **চ**=এবং ; **স্মৃতিসঙ্করঃ**=স্মৃতির মিশ্রণ ঘটবে।

ব্যাখ্যা—এক চিত্তকে অন্য চিত্তের দৃশ্য বলে মেনে নিলে একে তো অনবস্থার দোষ দেখা দেবে, দ্বিতীয়ত, স্মৃতি সংকরের দোষও উপস্থিত হবে। কারণ একটা চিত্ত কোনো বিষয়কে জেনেছে, দ্বিতীয়জনে সেই বিষয়সহ চিত্তকে জেনেছে, দ্বিতীয়কে তৃতীয়, তৃতীয়কে চতুর্থ—এইভাবে চলতে থাকলে তো একটা বস্তুর জ্ঞান কখনো সমাপ্ত হবে না। এইভাবে অনবস্থার দোষ দেখা দেবে এবং অনেক জ্ঞানের স্মৃতি একসঙ্গে দেখা দিলে নির্ণয় করা যাবে না কোন জ্ঞানের কী স্বরূপ, তখন স্মৃতির মিশ্রণ হবে। অতএব তা কারও অনুভবের বিষয় থাকবে না। সকলেই স্মরণ করে বলে না যে—'আমি সেই বস্তুকে জেনেছিলাম'। একথা কেউ বলে না যে অমুক বস্তুকে, তার জ্ঞানকে আবার তার (বস্তুর) জ্ঞানসহ জ্ঞানকে পুনরায় তার জ্ঞানসহ জ্ঞানকে আমি জেনেছিলাম—ইত্যাদি। অতএব দ্রষ্টাকে চিত্ত হতে

পৃথক বলে মনে করাই যুক্তিযুক্ত॥ ২১ ॥

সম্বন্ধ—*চিত্ত স্বপ্রকাশ নয় আবার অন্য চিত্তের বিষয়ও নয়, তাহলে এবার জানানো উচিত যে চিত্তের দ্রষ্টা কে ? কারণ পুরুষ তো অসঙ্গ ও নির্বিকার তিনি কারো দ্রষ্টা বা ভোক্তা হন কী করে ? এর উত্তরে জানাচ্ছেন :*

চিতেরপ্রতিসংক্রমায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্॥ ২২ ॥

চিতেঃ অপ্রতিসংক্রমায়াঃ=যদ্যপি চেতন-শক্তি (পুরুষ) ক্রিয়ারহিত ও অসঙ্গ, তথাপি ; **তদাকারাপত্তৌ**=তদাকার হয়ে যাওয়ার জন্য ; **স্ববুদ্ধিসম্বেদনম্**=(তার) নিজ বুদ্ধির (চিত্তের) জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—চেতন পুরুষ নির্বিকার, অপরিণামী, ক্রিয়াশূন্য, অসঙ্গ—এতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু বিকারশীল নানাপ্রকার দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্বের সঙ্গে তদাকারতাপ্রাপ্ত চিত্তের সম্বন্ধবশতঃ যখন তিনি সেই চিত্তের আকার যুক্তের মতো হয়ে যান[১] (যোগ. ১।৪) সেইসময় তার বৃত্তিসহ বুদ্ধির জ্ঞান জন্মায়। তখন তাকে নিজ বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির জ্ঞাতা ও ভোক্তা বলা হয়। বাস্তবে তো পুরুষ না জ্ঞাতা, না ভোক্তা, তিনি তো সর্বথা নির্বিকার, অসঙ্গ ও স্বপ্রকাশ চেতন মাত্র (যোগ. ২।২০)। তাৎপর্য হল চেতনের উপরাগে উপরঞ্জিত হওয়া বুদ্ধিকে কেবল অনুকরণকারীর ন্যায় প্রতিভাত হওয়ার জন্যই চেতনকে জ্ঞাতা বলা হয়॥ ২২ ॥

সম্বন্ধ—*কীজন্য এরকম হয় ? তার উত্তরে বলছেন :*

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্॥ ২৩ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং=দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এই দুইয়ের দ্বারা রঞ্জিত ; **চিত্তম্**=চিত্ত ; **সর্বার্থম্**=সমস্ত অর্থময় হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—চিত্ত যখন দৃশ্য বস্তু বা পদার্থের সঙ্গে মিশে তদাকার হয়ে নিজ

---

[১]যেমন, স্বচ্ছ স্ফটিকের সামনে যে রঙ রাখা হয়, সেটি সেই রঙে রঙিন হয়ে যায়।

স্বরূপের সঙ্গে দ্রষ্টার বিষয় (দৃশ্য) হয়ে তার সাথে সম্বদ্ধ হয়ে যায়, তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এই দুইয়ের তদাকার হয়ে উঠে অর্থাৎ ওই দুইয়ের প্রতিবিম্ব চিত্ততে পড়ার কারণে তা দুইয়ের আকার ধারণ করে নেয় এবং তার নিজ রূপও বর্তমান থাকে। সেইজন্য চিত্তই সর্বার্থময় হয়ে ওঠে অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের দ্রষ্টা পুরুষের এবং নিজের—এইভাবে সর্বরূপ ধারণ করে। একে এইভাবে বুঝতে হবে—

(১) চিত্ততত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব—এটা হল তিন গুণের (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ) প্রথম এবং সাত্ত্বিক পরিণাম। তা ক্রিয়াশীল, পরিণামী ও জড়। কিন্তু তা সাত্ত্বিক হওয়ার কারণে নির্মল স্ফটিক মণির মতো উজ্জ্বল এবং এটাই তার নিজস্ব রূপ।

(২) চিত্তের সামনে যখন যেরকম বাহ্য বস্তু বা পদার্থ উপস্থিত হয়, যার যার সঙ্গে চিত্ত সম্পর্কিত হয় তখনই তা তদাকার হয়ে যায় অর্থাৎ চিত্ত তখন সেই বস্তু প্রভৃতির রূপ বলেই প্রতীত হয়।

(৩) চৈতন্য পুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার জন্য চিত্ততত্ত্বে চৈতন্য-পুরুষের প্রতিফলন ঘটে বা ছায়া পড়ে। সেইজন্য তা তদাকার হয়ে চেতন রূপেই প্রতীত হয়।

বাস্তবে চিত্ত, তাতে প্রতিবিম্বিত বিষয় হতে এবং চেতন পুরুষ হতে সর্বথা ভিন্ন। কেবল ভুলবশতঃ অন্যরূপে প্রতীত হয়। অতএব কোনো কোনো দার্শনিক তো চিত্তকেই চেতন-দ্রষ্টা বলে মনে করেন এবং বলেন যে চিত্ত ভিন্ন অন্য কোনো দ্রষ্টা নেই। আবার অনেকে এতদূর পর্যন্ত মনে করেন চিত্ত ছাড়া দৃশ্যমান গাভী ঘট ইত্যাদি, এদের কারণরূপ পঞ্চভূত হতে জাত পদার্থও কিছুই নয়—চিত্তই সমস্ত রূপ ধারণ করে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু সমাধিসিদ্ধ যোগী যখন আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন তখন চৈতন্য-পুরুষ ও চিত্তের পৃথকত্ব স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করেন ॥ ২৩ ॥

সম্বন্ধ—*এখন চিত্ত হতে পৃথক দ্রষ্টা পুরুষের সত্তাকে দৃঢ় করার জন্য হেতুর উল্লেখ করছেন :*

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ॥ ২৪ ॥

তৎ=সেই (চিত্ত) ; **অসংখ্যেয়বাসনাভিঃ**=অসংখ্য বাসনার দ্বারা ; **চিত্রম্ অপি**=চিত্রিত হলেও ; **পরার্থম্**=পরের জন্য ; **সংহত্যকারিত্বাৎ**= কারণ সে সংহত্যকারী (মিলেমিশে কার্য করে)।

ব্যাখ্যা—যে বস্তু অনেক পদার্থের সঙ্গে মিলেমিশে বা অঙ্গাঙ্গিভাবে কার্য করে তাকে সংহত্যকারী বলা হয়। যেমন, গৃহ, ভোজন ইত্যাদি। এই ধরণের বস্তু কেবল নিজ হতে পৃথক অপরের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থিত, সেইজন্য তাকে পরার্থ বলা হয়। এই চিত্তও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ— এই তিন গুণের মিশ্রণে উৎপন্ন তথা বাহ্য পদার্থ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কার্য করে, অতএব এটি নিজের জন্য নয়। তা হল দ্রষ্টা পুরুষের জন্য এবং তারই ভোগ ও অপবর্গের সম্পাদনের জন্য নানা বাসনার দ্বারা রঞ্জিত। অতএব চিত্ত ও দ্রষ্টা পুরুষ পরস্পর পৃথক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য হল যে, যদ্যপি চিত্তে সমস্ত বাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়তে থাকে এবং তা অসংখ্য বাসনার রঙে রঙিন হয়ে থাকে, তথাপি তা স্বয়ংপ্রকাশ ও দ্রষ্টা নয়। কারণ তা (চিত্ত) বাহ্য পদার্থ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে থেকে কার্য করে অতএব তা পরের জন্য বা পরার্থে নিবেদিত॥ ২৪ ॥

সম্বন্ধ—*এ পর্যন্ত চিত্ত ও আত্মা—এই দুইয়ের পৃথকত্ব যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করা হয়েছে ; কিন্তু যুক্তির দ্বারা আত্মার স্বরূপ খুব সামান্যই বোঝা যায়। তাঁর স্বরূপের বিশেষ জ্ঞান সমাধি দ্বারা সম্ভব। অতএব সমাধি দ্বারা প্রাপ্ত বিবেক জ্ঞানের দ্বারা যখন যোগী আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন করেন, তখন তার লক্ষণ কী তা বলছেন :*

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ॥ ২৫ ॥

বিশেষদর্শিনঃ=(সমাধিজনিত বিবেক জ্ঞানের দ্বারা) চিত্ত ও আত্মার ভেদকে যিনি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর (সেই যোগীর) ; **আত্মভাবভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ**=(তাঁর) আত্মভাববিষয়ক ভাবনা সর্বথা নিবৃত্ত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা—নিজ স্বরূপকে জানার জন্য যোগী যখন উদগ্রীব হয়ে ওঠেন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বিষয়ে চিন্তন করতে থাকেন, জানতে চান 'আমি কে',

'কোথা থেকে এসেছি'—তা হল যোগীর আত্মভাবভাবনা। যোগী যত উচ্চস্তরেই থাকুন না কেন আত্মস্বরূপের জ্ঞান বিনা সবকিছু অপূর্ণ। কিন্তু বিবেক জ্ঞানের দ্বারা যাঁর শরীর, চিত্ত ও আত্মার একত্বের ভ্রম নষ্ট হয়ে গেছে, যিনি নিঃসংশয়ে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন অর্থাৎ আত্মা ও চিত্ত প্রভৃতির পৃথকত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর আত্মভাবনাও (আমি কে, কোথা থেকে এসেছি—জানার ইচ্ছা) সর্বাংশে শেষ হয়ে যায়। কারণ এখানেই যোগীর আত্মদর্শন পূর্ণ হয়—তাঁর আর কিছু জানার থাকে না॥ ২৫ ॥

সম্বন্ধ—*সেই যোগীর চিত্তের স্থিতি কেমন হয়, তা বলছেন :*

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্‌॥ ২৬ ॥

তদা=সেই সময় (যোগীর) ; **চিত্তম্**=চিত্ত ; **বিবেকনিম্নম্**=বিবেক-বান ; **কৈবল্য প্রাগ্‌ভারম্**= কৈবল্য অভিমুখী হয়।

ব্যাখ্যা—অজ্ঞান অবস্থায় সাধারণ মানুষের চিত্ত অজ্ঞাননিমগ্ন ও নিম্ন-গামী অর্থাৎ বিষয়-পরায়ণ বা বিষয়-অভিমুখী থাকে, ভোগরত থাকে। কিন্তু বিবেকজ্ঞানের উদয়ে যোগীর চিত্ত আর অসার সংসারের দিকে ধাবিত হয় না। সংসারে অনাসক্ত যোগীর চিত্তে তখন বিবেকজ্ঞানের প্রবাহ নিরন্তর বইতে থাকে, চিত্ত অন্তর্মুখ বা বিবেক নিমগ্ন হতে থাকে অর্থাৎ নিজ কারণে বিলীন হতে শুরু করে দেয়। চিত্তের নিজ কারণে বিলীন হয়ে যাওয়া এবং দ্রষ্টার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াসই হল চিত্তের কৈবল্য-অভিমুখী হওয়া (যোগ. ৪।৩৪)॥ ২৬॥

সম্বন্ধ—*যদি যোগীর চিত্ত বিবেকজ্ঞানের অভিমুখী থাকে তথা নিজ কারণে বিলীন হতে থাকে, তাহলে ব্যুত্থান অবস্থায় অন্য বৃত্তি কী ধরনের হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন :*

তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ॥ ২৭ ॥

তচ্ছিদ্রেষু=সেই (সমাধির) অন্তরালে ; **প্রত্যয়ান্তরাণি**=অন্য পদার্থের জ্ঞান ; **সংস্কারেভ্যঃ**=পূর্ব সংস্কারের প্রভাবে উপস্থিত হয়।

ব্যাখ্যা—বিবেকজ্ঞানে নিমগ্ন চিত্তে ব্যুত্থান অবস্থায় যে অন্য বস্তুর

প্রতীতি হতে দেখা যায়, তা দগ্ধ বীজের মতো বিদ্যমান পূর্বসংস্কার হতে উপস্থিত হয়॥ ২৭ ॥

সম্বন্ধ—*ওইসব সংস্কারের সম্পূর্ণরূপে নাশ কখন ও কেমন করে হয় ? এর উত্তরে বলছেন :*

হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্॥ ২৮ ॥

এষাম্=এই সংস্কারসমূহের ; **হানম্**=বিনাশ ; **ক্লেশবৎ**=ক্লেশের মতো ; **উক্তম্**=বলা হয়েছে।

ব্যাখ্যা—দগ্ধ বীজ সদৃশ যে সূক্ষ্ম ক্লেশ আছে, তার নাশ হয় প্রতি-প্রসবের দ্বারা অর্থাৎ কারণে কার্যকে লয়ের দ্বারা (যোগ. ২।১০)। এক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটি হয়। যতক্ষণ চিত্ত বর্তমান, ততক্ষণ সংস্কারের সর্বথা নাশ হয় না। তার নাশ হয় চিত্তের নিজ কারণ গুণে বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু দগ্ধ বীজের মতো জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হওয়া সংস্কার বিদ্যমান থাকলেও তা পুনর্জন্মের হেতু হয় না। সেই দগ্ধ সংস্কারজন্য পদার্থের জ্ঞান আর নতুন করে সংস্কারের জন্ম দেয় না (যোগ. ৪।৬)॥ ২৮ ॥

সম্বন্ধ—*বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর কী হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন :*

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

প্রসংখ্যানে অপি অকুসীদস্য=যে যোগীর বিবেকজ্ঞানের মহিমার প্রতিও বৈরাগ্য জন্মেছে, তাঁর ; **সর্বথা বিবেকখ্যাতেঃ**=বিবেকজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রকাশমান থাকায় সেই যোগীর ; **ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ**=ধর্মমেঘ সমাধি হয়।

ব্যাখ্যা—বিবেকজ্ঞানের উদয়ে যোগীর চিত্ত অনুপম স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় এবং তাতে এক বিশেষ শক্তির আবির্ভাব হয়। তখন যোগী সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন (যোগ. ৩।৪৯)। এই সামর্থ্য প্রাপ্তির পরও যিনি তার প্রয়োগ করেন না, সর্বজ্ঞতারূপ ঐশ্বর্যে আসক্ত হন না, বরং তাতে অনাসক্ত হন তখন তাঁর

চিত্তের সমস্ত বিষয়, সমস্ত কার্য, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি হয় এবং তাঁর বিবেকজ্ঞানে কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, তা নিরন্তর জাগ্রত থাকে। এই স্থানে উপনীত হলে যোগীর 'ধর্মমেঘ' নামক সমাধি লাভ হয়॥ ২৯ ॥

সম্বন্ধ——*ধর্মমেঘ সমাধির দ্বারা কী হয় ? তার উত্তরে বলছেন :*

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ॥ ৩০ ॥

ততঃ=তার (ধর্মমেঘ সমাধি) দ্বারা ; **ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ**=ক্লেশ ও কর্মের সর্বথা নাশ হয়।

ব্যাখ্যা——বিবেকজ্ঞানের দ্বারা যোগী যখন ধর্মমেঘ সমাধিতে সিদ্ধ হন, তখন তাঁর অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চ ক্লেশ এবং শুক্ল, কৃষ্ণ ও মিশ্র——এই তিন প্রকারের কর্মসংস্কার সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। সেই যোগীকে তখন জীবন্মুক্ত বলা হয়॥ ৩০ ॥

সম্বন্ধ——*সেইসময় যোগীর জ্ঞানের স্বরূপ কীরকম হয় ? সে বিষয়ে বলছেন :*

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্‌জ্ঞেয়মল্পম্॥ ৩১ ॥

তদা=সেই সময় ; **সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য**=যার সবরকমের আবরণ ও মল নষ্ট হয়ে গেছে, এমন জ্ঞান ; **আনন্ত্যাৎ**=অনন্ত (সীমারহিত) হয়ে যায়, সেইজন্য ; **জ্ঞেয়ম্ অল্পম্**=জ্ঞেয় পদার্থ অল্প হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা——বিবেক-জ্ঞান প্রাপ্তির পূর্বে জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করার যতরকম অবিদ্যা ও অজ্ঞানরূপ আবরণ আছে, কর্ম-সংস্কাররূপে যত মল সংগৃহীত হয়েছে, ধর্মমেঘ সমাধির দ্বারা সেইসব মল ও আবরণ নষ্ট হয়ে যায়। যোগী অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হন এবং তখন তাঁর জ্ঞেয় পদার্থ অল্প হয়ে যায়। সূর্যের প্রকাশে জোনাকির আলোর মতো অন্য সব ব্যবহারিক জ্ঞান তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যায় ; তিনি সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন এবং কোনো তত্ত্বই তাঁর অজ্ঞাত থাকে না॥ ৩১ ॥

সম্বন্ধ——*এখানে প্রশ্ন ওঠে যে তিন গুণই পরিণামশীল, সেইজন্য তার*

পরিণামও অবশ্যম্ভাবী। তাহলে তা যোগীর পুনর্জন্মের হেতু হবে না কেন ? উত্তরে বলছেন :

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তির্গুণানাম্॥ ৩২ ॥

ততঃ=তারপর ; **কৃতার্থানাম্**=নিজের কাজকে যারা সম্পূর্ণ করেছে সেই ; **গুণানাম্**=গুণসমূহের ; **পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ**=পরিণামক্রম (পরিণামসম্বন্ধীয় ব্যাপারের) সমাপ্তি ঘটে।

ব্যাখ্যা—যখন যোগীর ধর্মমেঘ সমাধির প্রাপ্তি হয়ে যায় তখন তাঁর জন্য গুণসমূহের আর কোনো করণীয় বাকি থাকে না। পুরুষকে ভোগ ও অপবর্গ প্রদান করার যে কাজ তা সম্পূর্ণতা লাভ করে। সেইজন্য প্রকৃতিতে নিরন্তর পরিবর্তনরূপ যে পরিণামক্রম—সমস্তই সেই যোগীর নিকট সমাপ্ত হয়ে যায়। অতএব সাধকের পুনর্জন্মের ইতি ঘটে॥ ৩২ ॥

সম্বন্ধ—*প্রসঙ্গানুসারে ক্রমের স্বরূপ বলছেন :*

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণপ্রতিযোগী=যা ক্ষণের প্রতিযোগী (এবং) ; **পরিণামাপরান্ত-নির্গ্রাহ্যঃ**=যার স্বরূপ পরিণামের অন্তে অনুভবযোগ্য হয়, তা ; **ক্রমঃ**=(হল) ক্রম।

ব্যাখ্যা—যে কোনো বস্তুর যখন এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তন হতে থাকে বা এক রূপে বিদ্যমান থেকেও ক্রমশঃ পুরানো হতে থাকে, তখন সেই পরিণাম কিন্তু একদিনে বা এক মুহূর্তে বা এক দণ্ডে হয় না। সেখানে প্রতিক্ষণেই পরিবর্তনের ক্রিয়া চলতে থাকে, তবে জানতে পারা যায় না। সেই বস্তুর দ্বিতীয় পরিণাম পূর্ণ হলে অনুমানের দ্বারা জানা যায় যে তার যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা কিন্তু এক দিনে হয়নি, ক্রমে-ক্রমে হয়েছে (যোগ. ৩।১৫ ও ৫২ নং সূত্রের টীকায় এই ক্রমের বর্ণনা করা হয়েছে)। এইভাবে ক্রম এর জ্ঞান পরিণামের অন্তে হয় বলে একে 'পরিণামা-পরান্তনির্গ্রাহ্য' বলা হয় এবং প্রতিটি ক্ষণের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকে। একটি ক্ষণের পর দ্বিতীয় ক্ষণ, তারপর তৃতীয় ক্ষণ— এইভাবে

ক্ষণের প্রবাহে যা পূর্বাপর জ্ঞাপক—তাকে ক্রম বলা হয়। সেইজন্য তাকে ক্ষণ-প্রতিযোগী বলা হয়েছে। ক্ষণপ্রতিযোগীর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, যা ক্ষণের প্রতিযোগী অর্থাৎ বিভাজক (বিভক্ত করে)—তা হল ক্রম॥ ৩৩ ॥

সম্বন্ধ—*পূর্বের ৩২ নং সূত্রে গুণের পরিণামক্রমের সমাপ্তিকে 'কৈবল্য' নাম দেওয়া হয়েছে। উক্ত কৈবল্যের স্বরূপের প্রতিপাদন করে এই শাস্ত্রের সমাপ্তি করছেন :*

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি॥ ৩৪ ॥

পুরুষার্থশূন্যানাম্=যাদের পুরুষের জন্য আর কোনো কর্তব্য বাকি নেই ; সেই ; **গুণানাম্**=গুণসমূহের ; **প্রতিপ্রসবঃ**=নিজ কারণে বিলীন হয়ে যাওয়া ; **কৈবল্যম্**=হল কৈবল্য ; **বা**=অথবা ; **ইতি**=যাকে বলা হয় ; **চিতিশক্তেঃ**= দ্রষ্টার ; **স্বরূপপ্রতিষ্ঠা**=নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া (কৈবল্য)।

ব্যাখ্যা—পুরুষকে (আত্মা) ভোগ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করার জন্যই গুণসমূহের প্রবৃত্তি। এই কার্য সম্পাদন করার জন্য সে (গুণ) বুদ্ধি-অহংকার, তন্মাত্র, মন, ইন্দ্রিয়, শব্দ ইত্যাদি আকারে পরিণত হয়। যে পুরুষকে এই গুণ ভোগ করিয়ে অপবর্গ (মুক্তি) প্রদান করে, তারপর তার জন্য তার আর কোনো কর্তব্য বাকি থাকে না অর্থাৎ পুরুষ তখন কেবল অর্থাৎ নির্গুণ হন—এই হল গুণের কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। ওই গুণের সঙ্গে পুরুষের যে অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যাকৃত সংযোগ ছিল, তা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া—এই হল পুরুষের কৈবল্য অর্থাৎ প্রকৃতি হতে সর্বথা পৃথক হয়ে আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া (যোগ.২।২৫)॥ ৩৪ ॥



॥ শ্রীহরি ॥

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচীপত্র

কোড নং

(১) 1118 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (তত্ত্ব-বিবেচনী) বৃহৎ আকারে,**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতা-বিষয়ক ২৫১৫টি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সমগ্র গীতা-গ্রন্থের বিষদ্ ব্যাখ্যা

(২) 763 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাধক-সঞ্জীবনী)**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ ব্যাখ্যাসহ সুবৃহৎ টীকা। সাধকগণের আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশের এক অনুপম গ্রন্থ। **সুবৃহৎ আকারে।**

(৩) 556 **গীতা-দর্পণ, বৃহৎ আকারে**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লিখিত ১০৮টি বিষয়ের সামগ্রিক দর্শন ভিত্তিক অভিনব আলোচনা। গীতার গভীরে প্রবেশে ইচ্ছুক জিজ্ঞাসুদের পক্ষে বইটি খুবই উপযোগী।

(৪) 13 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অন্বয়, পদচ্ছেদসহ প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ সহ সরল অনুবাদ।

(৫) 496 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

মূল শ্লোকসহ সরল অনুবাদ

(৬) 1393 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (বোর্ড বাইন্ডিং)

(৭) 395 **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা** (লঘু আকারে)

(৮) 1455 **গীতা-মাধুর্য**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

প্রতিটি শ্লোকের পৃষ্ঠভূমিতে প্রশ্নোত্তররূপে উপস্থাপিত এই বইটি নবীন এবং প্রবীণ সকলকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

কোড নং

(৯) **1444 শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা**

অতি ক্ষুদ্র আকারে সমগ্র মূল শ্লোকের অভিনব সংস্করণ।

(১০) **954 শ্রীরামচরিতমানস (রামায়ণ) বৃহৎ আকারে**

তুলসীদাসের অমরকীর্তি, মূল দোঁহা চৌপাই-এর সরল অনুবাদ।

(১১) **1577 শ্রীমদ্‌ভাগবত**

মূলসহ সরল অনুবাদ।

(১২) **1574 সংক্ষিপ্ত মহাভারত**

আদিপর্ব থেকে দ্রোণপর্ব পর্যন্ত মহাভারতের সচিত্র সাবলীল বর্ণনা।

(১৩) **275 কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধন পথের গূঢ় তত্ত্বের সহজ আলোচনা।

(১৪) **1456 ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

ঈশ্বরলাভের সাধনায় রত সাধকদের পক্ষে একটি অপরিহার্য পুস্তক।

(১৫) **1119 ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ?**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বইটি খুবই উপযোগী।

(১৬) **1305 প্রশ্নোত্তর মণিমালা**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক ৫০০টি প্রশ্নের মূল্যবান সমাধান সূত্র।

(১৭) **1604 পাতঞ্জল যোগ**

মহর্ষি পাতঞ্জলীর সুবিখ্যাত যোগগ্রন্থের অন্বয়,
পদচ্ছেদ সহ সরল ভাবানুবাদ।

(১৮) **1603 উপনিষদ্**

আদি জগৎগুরু শংকরাচার্যের সুপ্রসিদ্ধ ন'টি
উপনিষদের অন্বয়, পদচ্ছেদসহ সরলতম ব্যাখ্যা।

(১৯) **1102 অমৃত-বিন্দু**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সূত্ররূপে উপস্থাপিত এক সহস্র অমৃত বাণীর অভূতপূর্ব সংকলন।

(২০) **1115 তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ?**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

কোড নং

তত্ত্বজ্ঞান লাভের একটি সরল মার্গ-দর্শিকা।

(২১) 1358 **কর্ম রহস্য**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

ভগবান গীতায় বলেছেন **'গহনা কর্মণো গতিঃ'**—

সেই কর্ম-তত্ত্বের অনুপম বর্ণনা।

(২২) **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত**

শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত আকর গ্রন্থের সরল ভাষায় টীকা ও ব্যাখ্যাসহ অভিনব সংস্করণ।

(২৩) 1122 **মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ?**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

গুরু বিষয়ক বিভিন্ন শঙ্কা-সমাধানের উদ্দেশ্যে লিখিত এই পুস্তিকাটি বর্তমানে প্রতিটি লোকেরই একবার অবশ্য পড়া কর্তব্য।

(২৪) 276 **পরমার্থ পত্রাবলী**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

সাধকগণের উদ্দেশ্যে লিখিত ৫১টি আধ্যাত্মিক পত্রের দুর্লভ সংকলন।

(২৫) 816 **কল্যাণকারী প্রবচন**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধকগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ১৯টি অমূল্য প্রবচনের সংস্করণ।

(২৬) 1460 **বিবেক চূড়ামণি** (মূল সহ সরল টীকা)

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বিরচিত জ্ঞানমার্গের সুপরিচিত গ্রন্থ।

(২৭) 1454 **স্তোত্ররত্নাবলি**

প্রাচীন বিভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ স্তোত্রের মূলসহ সরল অনুবাদ।

(২৮) 903 **সহজ সাধনা**

লেখক —স্বামী রামসুখদাস

সাধনার সহজ দিগ্‌-দর্শন।

(২৯) 312 **আদর্শ নারী সুশীলা**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত ২৬টি দৈবীগুণকে কেন্দ্র করে একটি মহিলার জীবন-চরিত্র।

(৩০) 1316 **কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি**

লেখক —জয়দয়াল গোয়েন্দকা

কর্ম-তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা।

কোড নং

(৩১) 955 তাত্ত্বিক-প্রবচন
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
গভীর তত্ত্বের সরলতম ব্যাখ্যা।

(৩২) 428 আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
বর্তমানের অশান্ত পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত পুস্তিকা।

জয়দয়াল গোয়েন্দকা প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৩৩) 296 সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা
(৩৪) 1359 পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি
(৩৫) 1140 ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব
(৩৬) 1415 অমৃত বাণী

স্বামী রামসুখদাস প্রণীত অন্যান্য বাংলা বই—

(৩৭) 1303 সাধকদের প্রতি
(৩৮) 1452 আদর্শ গল্প সংকলন
(৩৯) 1453 শিক্ষামূলক কাহিনী
(৪০) 625 দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম
(৪১) 956 সাধন এবং সাধ্য
(৪২) 1469 সর্বসাধনার সারকথা
(৪৩) 1541 সাধনার দুটি প্রধান সূত্র
(৪৪) 1579 সাধনার মনোভূমি
(৪৫) 1581 গীতার সারাৎসার
(৪৬) 1580 অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়
(৪৭) 449 দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং গুরুতত্ত্ব
(৪৮) 451 মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া
(৪৯) 443 সন্তানের কর্তব্য
(৫০) 469 মূর্তিপূজা
(৫১) 849 মাতৃশক্তির চরম অপমান
(৫২) 1319 কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা

কোড নং

(৫৩) 1075 ওঁ নমঃ শিবায়
(৫৪) 1043 নবদুর্গা
(৫৫) 1096 কানাই
(৫৬) 1097 গোপাল
(৫৭) 1098 মোহন
(৫৮) 1123 শ্রীকৃষ্ণ
(৫৯) 1292 দশাবতার
(৬০) 1439 দশমহাবিদ্যা
(৬১) 1103 মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র
(৬২) 330 ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য)
(৬৩) 626 হনুমানচালীসা
(৬৪) 848 আনন্দের তরঙ্গ
(৬৫) 1356 সুন্দরকাণ্ড
(৬৬) 1322 শ্রীশ্রীচণ্ডী
(৬৭) 1478 মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ
লেখক —স্বামী রামসুখদাস
মুমুক্ষু সাধকগণের পক্ষে দুরুহ তত্ত্বের সরলতম মার্গদর্শিকা।
(৬৮) 762 গর্ভপাত করানো কি উচিত —
আপনিই ভেবে দেখুন
(৬৯) 450 ঈশ্বরকে মানব কেন ? নামজপের মহিমা
এবং আহার শুদ্ধি
(৭০) 1293 আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে
কয়েকটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য
(৭১) 1496 পরলোক এবং পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা
(৭২) 1513 মূল্যবান কাহিনী
(৭৩) 1495 ছবিতে চৈতন্যলীলা



॥ শ্রীহরিঃ ॥

গীতা তত্ত্ব বিবেচনী

(লেখক—জয়দয়াল গোয়েন্দকা)

আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার মোট শ্লোক সংখ্যা সাতশ। এই শ্লোকগুলির অন্তর্গত শব্দ সংখ্যা প্রচুর। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে কখনও কখনও একাধিক শব্দকে সন্ধি করে একটি শব্দে পরিণত করা হয়ে থাকে। গীতাতেও তেমন শব্দ আছে। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে শব্দ সংখ্যা প্রায় অগণিত হয়ে যাবে। 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা তত্ত্ব বিবেচনী' গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হল এটি সাধারণ অর্থে গীতার টীকা নয়। আবার শব্দার্থও নয়। বলা বাহুল্য এমন গ্রন্থ তো আছে। এই গ্রন্থটিতে শ্লোকগুলির অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। অধ্যাত্ম আলোকে প্রোজ্জ্বল ভাবসমৃদ্ধ এবং ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণীর সঙ্কলন হলো গীতা গ্রন্থ। এটি দেশ এবং কালাতীত। এটি সকল দেশের এবং সকল কালের। এমন গ্রন্থের শ্লোকান্তর্গত শব্দগুলির শাব্দিক এবং প্রায়োগিক অর্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **'তত্ত্ব বিবেচনী'** গ্রন্থে প্রশ্নোত্তরাকারে সেই সব শব্দের মর্মকথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন ভগবৎ পথের পথিক জয়দয়াল গোয়েন্দকা।

গীতার অতল সমুদ্রে যাঁরা অবগাহন করেন তাঁদের মনে স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন উদিত হয়, সেইসব প্রশ্ন বিচিত্রমুখী। অর্থাৎ সেইসব প্রশ্নের কোনোটি নিছক কৌতূহলউদ্দীপক আবার কোনোটি গভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার দ্যোতক। এই গ্রন্থের টীকাকার জয়দয়াল গোয়েন্দকা সব প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিয়ে পাঠকের শংকা সমাধান করেছেন এবং জীবনের অন্ধকারময় পথে আলোর সংকেত দেখিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করেছেন, **'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ'** অর্থাৎ ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছে। এই প্রথম শ্লোকের কথা নিয়েই পাঠকের মনের প্রশ্ন—কুরুক্ষেত্র কোথায় এবং তাকে ধর্মক্ষেত্র কেন বলা হয়েছে ? এই প্রশ্নটির মধ্যে ভূগোল, ইতিহাস এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্বের ঝলক বিদ্যমান। বলা বাহুল্য

উত্তরেও সেই কথাই বলা হয়েছে। আবার অন্তিম শ্লোকে সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর এবং অর্জুনকে ধনুর্ধর বলে অভিহিত করে কী ভাব প্রকাশ করেছেন সেই প্রশ্নও করা হয়েছে। এবং এর উত্তরে টীকাকার সমগ্র গীতা গ্রন্থের মর্মবাণী উপস্থাপিত করেছেন। সেজন্য গীতাপীপাসু ব্যক্তিদের কাছে **'তত্ত্ব বিবেচনী'** এক অমূল্য সম্পদরূপেই বিবেচিত হবে।

শ্রীহরিঃ ॥

গীতা সাধক সঞ্জীবনী

(লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

সহস্রাধিক পৃষ্ঠার **'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাধক-সঞ্জীবনী'** গ্রন্থটি যেমন আকারে বৃহৎ তেমনই অতীব তথ্য সমৃদ্ধ। ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী সম্বলিত মূল গীতা গ্রন্থটি আকারে অবশ্যই সুবৃহৎ নয়, কিন্তু এই গ্রন্থটি চিরকালীন ভাববাহী তথ্যের আকর। এর গভীরতা অপরিমেয়। সাগর সদৃশ এই গ্রন্থের গভীরে অবগাহন করলে নতুন নতুন রত্নরাশির সন্ধান পাওয়া যায়। তাই এর টীকা অনেক এবং এখনও এর নতুন নতুন টীকা বা ব্যাখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে। স্বামী রামসুখদাসকৃত **'সাধক সঞ্জীবনী'** এই রকমই এক সুবৃহৎ টীকা গ্রন্থ। এর পাঠে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারমর্ম যেমন অনুধাবন করা যাবে তেমনই এর প্রত্যেকটি শ্লোক এবং এর কেবল প্রত্যেকটি শ্লোকই নয়, শ্লোকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দের নিহিতার্থও স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে এর পঠন বিভিন্ন মার্গের সাধকদের কাছে যেমন ফলদায়ক তেমনই অধ্যাত্ম-প্রেরণায় যাঁরা উৎসাহী তাঁদের কাছেও দিশাসঞ্চারী। প্রকৃতপক্ষে সেই দৃষ্টিতে গ্রন্থটির নামকরণে সঞ্জীবনী কথাটি খুবই অর্থবহ এবং সার্থক।

গীতা দর্পণ

(লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

এই গ্রন্থটি গীতা সম্বন্ধিত অনেক নতুন বিষয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন। এতে গীতায় বর্ণিত ১০৮টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা

হয়েছে। গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত—পূর্বার্ধ এবং উত্তরার্ধ। এছাড়াও পরিশিষ্টে গীতার সূক্তি-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অনেকার্থ শব্দকোষও সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থটি এক দিকে যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই ভাষা ও বর্ণনা শৈলীর দৃষ্টিতেও এটি উপভোগ্য। সেজন্য গ্রন্থটি পাঠে সাধারণ পাঠকেরা যেমন উপকৃত হবেন তেমনই গভীর অধ্যয়নশীল সাধকেরাও এতে তাঁদের জ্ঞানান্বেষণের রসদ সংগ্রহ করতে পারবেন। বস্তুত **'গীতা দর্পণ'** পাঠে গীতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংশয়ের অবসান অবশ্যম্ভাবী।

গীতা মাধুর্য

(লেখক—স্বামী রামসুখদাস)

আঠারটি অধ্যায়ে বিভক্ত গীতা অধ্যাত্ম রসের এক ভাণ্ডার। শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত বাণী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে কথিত এই বাণীগুলির আবেদন কালাতীত। আর সেজন্য গীতার বাণীগুলির প্রতি মানুষের কৌতুহল অপরিসীম। **'গীতা মাধুর্য'** বইটিতে গীতার পটভূমি বর্ণনা করার পর প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ করা হয়েছে এবং প্রশ্নোত্তরাকারে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুত প্রশ্নগুলি অতি সমীচিন এবং সেগুলির যে উত্তর দেওয়া হয়েছে সেগুলিও হৃদয়গ্রাহী। বইটি বৃহৎ নয়, কিন্তু এর বিষয়বস্তু বিশাল। এখানে বিষয়গুলিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে ঝর্ণার স্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর গতি প্রবাহ স্বাভাবিক ছন্দময় এবং পাঠক যখন এতে অবগাহন করবেন তখন তিনি তাঁর অজান্তেই এর স্রোতে বাহিত হয়ে যাবেন। সেজন্য বইটির **'গীতা মাধুর্য'** নাম সার্থক।

